KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Card No: KLMLGK 200…	Place of Publication: ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection: KLMLGK	Publisher: আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title: সমকালীন (SAMAKALIN)	Size: 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number: ২৩/- ২৩/- ২৪/- ২৪/-	Year of Publication: ভাদ্র ১৩৮২ " Sep 1975 কার্তিক ১৩৮২ " Nov 1975 আষাঢ় ১৩৮৩ " July 1976 ভাদ্র ১৩৮৩ " Sep 1976
	Condition: Brittle ✓ Good ✓
Editor: আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks:

CD. Ref. No.: KLMLGK

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

ত্রয়োবিংশ বর্ষ ॥ কার্তিক ১৩৮২

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

With the best compliments of :

TATA STEEL

সমকালীন

প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে)। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক সাড়ে সাত টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাকটিকিট বা রিপ্লাই কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থে প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প সাহিত্য, সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না—সমকালীন 'প্রবন্ধের পত্রিকা'।

লেখার মধ্যে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করবেন না। ইংরেজীর পরিবর্তে বাংলা-হরফে লিখে দেবেন।

'সমকালীন'-এর গ্রন্থ-পরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা 'শিল্প', 'দর্শন', 'সমাজ-বিজ্ঞান' ও সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থের বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন : ২৩-৫১৫৪

ত্রয়োবিংশ বর্ষ ৭ম সংখ্যা কার্তিক তেরশ' বিরাশী

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন বোস ॥ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ২৭৭

অখ্যাত এক ভারত পর্যটক জন জুর্ডেন ॥ নারায়ণ দত্ত ২৮১

দর্শনশাস্ত্র ও ভাষা ॥ পুণ্যশ্লোক রায় ২৯২

রবীন্দ্রযুগ ও যতীন্দ্রনাথ ॥ বিনতা চট্টোপাধ্যায় ৩০২

কর্তাভজা ॥ গোবিন্দগোপাল সেনগুপ্ত ৩০৯

সমালোচনা : স্মৃতিকথা ॥ গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ৩১১

সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমবায়নীতি

'মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ গ্রামের মধ্যেই ; এইখানেই প্রাণের নিকেতন , লক্ষ্মী এইখানেই তাঁহার আসন সন্ধান করেন।'—গ্রন্থের ভূমিকা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমবায়নীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে যে-সকল প্রবন্ধ লিখেছিলেন ও বক্তৃতা দিয়েছিলেন এই গ্রন্থে সেগুলি সংকলিত। মূল্য ২·০০

পল্লী-প্রকৃতি

এ দেশের পল্লীসমস্যা ও পল্লীসংগঠন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী—শ্রীনিকেতনের আশা ও উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা। অধিকাংশ রচনাই ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয়নি। মূল্য ৪·৫০ টাকা

স্বদেশী সমাজ

'যে দেশে জন্মেছি কী উপায়ে সে দেশকে সম্পূর্ণ আপন করে তুলতে হবে'—এ বিষয়ে জীবনের বিভিন্ন পর্বে রবীন্দ্রনাথ বারবার যে আলোচনা করেছেন তারই কেন্দ্রবর্তী হয়ে আছে স্বদেশী সমাজ (১৩১১) প্রবন্ধ। সেই প্রবন্ধ ও তারই আনুষঙ্গিক অন্যান্য রচনা ও তথ্যের সংকলন স্বদেশী সমাজ গ্রন্থ। মূল্য ৩·০০ টাকা

* রবীন্দ্রনাথ-রচিত জাতীয় আদর্শমূলক আরও কয়েকটি গ্রন্থ *

সভ্যতার সংকট ১·৫০ ॥ স্বদেশী ২·৭৫

The Co-operative Principle, 1·50

Crisis in Civilization, 1·00

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

কার্যালয় : ১০ প্রিটোরিয়া ষ্ট্রীট। কলিকাতা ২৬

বিক্রয়কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার/২১০ বিধান সরণী

কার্তিক
তেরশ' বিরাশী

সমকালীন

ত্রয়োবিংশ বর্ষ
৭ম সংখ্যা

ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন বোস

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে আমি বসু বিজ্ঞান মন্দিরে যোগদান করি। তখন সেখানকার অনেককেই আমি চিনতাম না। ডক্টর ডি. এম. বোসের নাম শুনেছি, কিন্তু তাঁকে চাক্ষুষ দেখিনি। একদিন আমি আর একজন পুরাতন কর্মী বাইরে থেকে একসঙ্গে আসছিলাম। গেটের মধ্যে ঢোকবার কিছু আগেই ফাইলের মত কিছু একটা হাতে নিয়ে সুদর্শন এক ভদ্রলোক ঠিক সেই সময়েই গেটে ঢুকছিলেন। আমরা একটু দাঁড়িয়ে গেলাম। আমার সঙ্গী একটু নিম্নকণ্ঠে আমাকে বললেন—ইনি হচ্ছেন ডক্টর ডি. এম. বোস, স্যার জগদীশের ভাগিনেয়—সায়েন্স কলেজের অধ্যাপক। যতক্ষণ তিনি বাড়ীর দিকে যাচ্ছিলেন ততক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম—কি সুন্দর চেহারা! চোখে মুখে যেন উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ দীপ্তি। এই একদিন মাত্র দেখেছিলাম। তারপর বহুদিন আর দেখিনি।

বিজ্ঞান মন্দিরের মধ্যস্থলে সবুজ ঘাসে ঢাকা একটি বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন, প্রাঙ্গনের পূর্বদিকে প্রকাণ্ড একটা নিমগাছ ছিল। গাছটার মোটা গুঁড়িটা ঘিরে চেয়ারের মত হেলান দিয়ে বসবার মত একটা আসন তৈরী করা হয়েছিল। পড়ন্ত বেলায় কর্তাব্যক্তিদের কেউ কেউ ওখানে বসে বিশ্রাম করতেন। তখন আমি উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ নিয়ে মাইক্রোস্কোপের কাজ করছি। বাকী সময়টা পোকা-মাকড় সংগ্রহ এবং সেগুলিকে যথাযথ ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থায় ব্যাপৃত থাকতাম। একদিন সন্ধ্যার কিছু আগে নিমগাছটার কাছাকাছি আগাছার ঝোপের মধ্যে একমনে পোকা-মাকড় সংগ্রহ করছিলাম। অলক্ষিতে কখন ডক্টর বোস এসে নিমগাছের আসনটাতে বসেছিলেন, মোটেই টের পাইনি। হঠাৎ তিনি আমাকে ডেকে বললেন—আপনি ফ্যাবারের বই পড়েছেন? অসম্মতিসূচক জবাব দিতেই তিনি

বললেন—বইখানা পড়ে দেখবেন—নিজের চোখে দেখে কতরকম কীট-পতঙ্গের ক্রিয়া কৌশল, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে কত অদ্ভুত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম—ফিজিক্সের লোক হয়েও কীট-পতঙ্গ সম্বন্ধে তাঁর এত উৎসাহের সৃষ্টি হলো কেমন করে!

এর পরে অনেক দিন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার আর যোগাযোগ ঘটেনি। ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ ঘটলো ৩৮ সালে, যখন তিনি বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেক্টরের পদে যোগদান করেন। ইতিমধ্যে কীট-পতঙ্গ সম্বন্ধে গবেষণামূলক আমার কিছু-কিছু লেখা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি ডিরেক্টর হয়ে আসবার আগেই আমার সম্বন্ধে আচার্য জগদীশচন্দ্রের কাছে কিছু শুনে থাকবেন। এখানে আসবার পর একদিন তিনি আমাকে বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের ট্রানজাক্‌শনস্-এর বাইরে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক নিবন্ধগুলি দেবার অনুরোধ করলেন। তাঁর কথামত লেখাগুলির রিপ্রিণ্ট তাঁকে পড়তে দিলাম। অল্প কিছুদিন বাদেই—তিনি ঐসব গবেষণা নিয়ে আলোচনা করলেন। কয়েকটি কাজ সম্বন্ধে তিনি আগ্রহ দেখালেন। ফ্যাবারের বই-এর নাম করে যে দিন তিনি আমাকে অযাচিত ভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন—সেদিনের মতই বিস্মিত হলাম। কীট-পতঙ্গ সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান এবং উৎসাহের পরিচয়—তারপর বহুবার পেয়েছি। শুধু কীট-পতঙ্গ নয়, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ছিল তাঁর অবাধ গতায়াত। যার প্রমাণ—বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি বার বারে দিয়েছিলেন। যাই হক, আচার্য জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর ডক্টর বোসের কাছে পেলাম গবেষণার প্রেরণা এবং শিক্ষা। তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা তাঁর কাছে শিক্ষা নিয়েছিলেন, তাঁদের কাছে শুনতাম তাঁর প্রশংসা। গবেষণাগারে তাঁর কাছে নির্দেশ ও শিক্ষা পাবার পর বুঝেছিলাম—তাঁর ছাত্ররা কেন তাঁকে শ্রদ্ধা করে। আমার সৌভাগ্য তাঁর কাছে ৩৩ বছর কাজ করেছি, শিক্ষা পেয়েছি। আচার্য জগদীশচন্দ্রের পর তাঁর মত শিক্ষক পেয়েছিলাম বলেই হয়তো কিছু সামান্য কাজ করতে পেরেছি। বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষক হিসাবে দেশ-বিদেশের বহু খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের সান্নিধ্য পেয়েছিলাম। কিন্তু ডক্টর বোসের মতো শিক্ষক পাইনি। তিনি আমাদের ডিরেক্টর মাত্র ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে পারতাম, প্রশ্ন করতে পারতাম, তর্ক করতে পারতাম। নিজের পছন্দসই কাজ করবার স্বাধীনতাও পেতাম। তুলনার জন্য নয়, ব্যক্তিগত, নিছক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলতে গেলে বারবার মনে হয় আচার্য জগদীশচন্দ্রের কাছে যেখানে আড়ষ্ট বোধ করতাম, সেক্ষেত্রে ডক্টর বোসের কাছে বোধ করতাম স্বাচ্ছন্দ। আভিজাত্যমণ্ডিত এক প্রবল বক্তিত্বসম্পন্ন রাশভারি মানুষ ছিলেন ডক্টর বোস। নিয়মানুবর্তিতায় কঠোর মানুষটি চলতেন ঘড়ির কাঁটা ধরে।

একবার ডক্টর বোস আমাকে ডেকে বললেন, লজ্জাবতী, নেপচুনিয়া, স্প্যাগজিনি, কামরাঙা প্রভৃতি স্পর্শকাতর উদ্ভিদ সম্বন্ধে আচার্য জগদীশচন্দ্রের সিদ্ধান্তগুলিকে আরো দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবার তিনি পরিকল্পনা করেছেন। আর এই কাজে তিনি আমাকেও উৎসাহিত করলেন। প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে—এক সময়ে উদ্ভিদের উপর যখন কাজকর্ম চালাচ্ছিলাম তখন লক্ষ্য করেছিলাম লজ্জাবতী-লতার পালভাইনাসে যে দানাদার বস্তুগুলি আছে সেগুলি বিদ্যুৎস্পর্শে সংকুচিত হয়। পালভাইনাসের ফোলা অংশের নীচের দিকটি কেটে বাদ দিলে লজ্জাবতী পাতা নীচে হেলে পড়ে। আবার ফোলা

অংশের উপরের দিকটা কেটে বাদ দিলে পাতাগুলি উঠে পড়ে, হেলে পড়ে না। একই সময় কলমিলতা নিয়েও পরীক্ষা চালাচ্ছিলাম। কলমিলতার কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ করবার পর লক্ষ্য করলাম কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওর ভিতরে নতুন ধরণের কোষ উৎপন্ন হয়েছে। প্রস্থচ্ছেদের পর এ ধরণের কলাবিন্যাসের অভিজ্ঞতা ছিল না। আচার্য জগদীশচন্দ্রকে সমস্ত পর্যবেক্ষণের ফলাফল জানালাম। তিনি উৎসাহিত হয়ে একটি লেখা তৈরি করে দিতে বললেন। যথসময়ে তাঁকে লেখা দিলাম। লেখাটা পড়বার পর তাঁকে কিছুটা চিন্তিত দেখলাম। পরে তিনি জানালেন যে, লেখাটা প্রকাশ করা হবে না। খুবই ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম। ক্ষোভ থেকে ঠিক করেছিলাম উদ্ভিদ নিয়ে কোনও কাজ করবো না। তাই হঠাৎ দীর্ঘদিন বাদে ডক্টর বোসের আহ্বান পেয়ে মনে মনে খুশি হয়েছিলাম। প্রচণ্ড উৎসাহে কাজ আরম্ভ করলাম। নানা রকম পরীক্ষার ফল হল আমরা যা চাইছিলাম তার বিপরীত। ডক্টর বোসকে বললাম। তিনি আরো কয়েকজনকে দিয়ে আমার পরীক্ষাটা করালেন। প্রতিবারই ফল হল একই। পরীক্ষার ফলাফল দেখে ডক্টর বোস বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। ৩৩।৩৪ বৎসরের মধ্যে তাঁকে এতটা বিচলিত হতে আর কোনদিনই আমি অন্তত দেখিনি। গবেষণা কাজ হয়ে গেল। লজ্জাবতীলতা দিয়ে এই পরীক্ষা বিজ্ঞান মন্দিরে তারপর আর হয় নি। অন্তত আমার জানা নেই। কিন্তু ডক্টর বোস এই পরীক্ষার ফল লিখিতভাবে প্রকাশের অনুমতি দিলেন। কিছু অংশ প্রকাশিত হল বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ট্রানজ্যাক্‌শনস্-এ। (উৎসাহী পাঠকের জন্য গবেষণাপত্রটির নাম দেওয়া হল 'অন দি কেমিক্যাল নেচার অব সাবস্‌ট্যান্‌সেস্ হুইচ আর (১) এফেক্‌টিভ ইন দি ট্রানস্‌মিশন অব একসাইটেণ্ট ইন মাইমোসা পাডুকা, এ্যাণ্ড (২) 'একটিভ' ইন দি কনট্র্যাক্‌শন অব ইউস পালভাইনাস'—বি ব্যানার্জি, জি ভট্টাচার্য, ডি এম বোস, ১৯৪৬, ট্রানজ্যাকশনস্, ১৯৪৪-৪৬, পৃঃ ১৫৫-১৭৬)।

উদ্ভিদের উপর তারপর আর কাজকর্ম করবার সুযোগ না হলেও, ডঃ বোসের প্রচেষ্টায় কীট-পতঙ্গ সম্পর্কিত গবেষণার অধিকতর সুযোগ পেয়েছিলাম। তখন পিঁপড়ের 'পলিমরফিজম' সম্পর্কে কাজ করছিলাম। প্রায়ই তিনি নানাভাবে উৎসাহ দিতেন। একদিন তিনি আমাকে বললেন, আমেরিকায় একটা নতুন জিনিষ দেখা গেছে। ওখানকার পেনিসিলিন ষ্ট্রেপটোমাইসিন কারখানায় অ্যান্টিবায়োটিক উপাদানের পরিত্যক্ত অংশ খেয়ে মুরগী আর শুকরেরা বেশ মোটা হয়ে যাচ্ছে। তিনি এই পরীক্ষাটা পিঁপড়ের উপর করবার জন্য বললেন। লিটারেচারের নামও এনে দিলেন। ডক্টর বোসের কথামত পিঁপড়েদের পেনিসিলিন খাওয়াতে সুরু করলাম। দেখা গেল পেনিসিলিন খাওয়া পিঁপড়েদের ডিম থেকে যেমন কর্মী পিঁপড়ে জন্মাচ্ছে তারা আকৃতিতে সাধারণ কর্মী পিঁপড়ের চেয়ে ছোট হয়ে পড়ছে। শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ ছোট। ঐ একই সময়ে পরিবেশ অনুযায়ী দৈহিক বর্ণের পরিবর্তনের উপর কাজ করছিলাম। সেই জন্যে বিভিন্ন কাচের ট্যাঙ্কে অনেকগুলি ব্যাঙাচি (রাণা টাইগ্রিনা) রেখেছিলাম। পিঁপড়ের উপর পেনিসিলিন প্রয়োগের পরীক্ষায় মনোমত ফল না পাওয়াতেই ব্যাঙাচির উপর পরীক্ষা করার বাসনা হয়। একদিন একটি ট্যাঙ্কে পেনিসিলিন মিশিয়ে দিলাম। দিন দশেক বাদে দেখলাম যে ট্যাঙ্কে পেনিসিলিন দেওয়া হয়েছিল তার ভিতরকার ব্যাঙাচিরা একই রকম আছে, হ্রাস-বৃদ্ধি কিছুই ঘটেনি। অথচ অন্যান্য ট্যাঙ্কের ব্যাঙাচিরা অধিকাংশই ব্যাঙাচিত্ব ঘুচিয়ে ব্যাঙ হয়ে জলে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে।

ডঃ বোসকে জানাতেই তিনি এলেন। দেখলেন, সব শুনলেন। গবেষণা চালাবার জন্য উৎসাহ দিলেন। নানাভাবে লিটারেচার সংগ্রহ করে, মূল্যবান সময় থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই গবেষণার জন্যে তিনি ব্যয় করলেন। ডঃ বোসের নির্দেশ মতই গবেষণার প্রাথমিক ফলাফল পাঠালাম সায়েন্স এ্যাণ্ড কালচার-এ। (দ্রঃ রিটার্ডেশন অব মেটামর্ফোসিস্ ইন ট্যাডপেলস্ বাই অ্যাণ্টিবায়োটিক ট্রিটমেণ্ট সায়েন্স এ্যাণ্ড কালচার, মে, ১৯৫৪)

গবেষণার প্রাথমিক সাফল্যের পর তিনি এই গবেষণাকে পুরোদমে চালাবার জন্য পরিকল্পনা করলেন। ডঃ প্রমথনাথ নন্দী এলেন, পরে এলেন তরুণ গবেষক ডঃ অজিতকুমার মেদ্দা। এই গবেষণা চালাবার সময় দেখলাম ডঃ বোসের তরুণের উৎসাহ। প্রতিদিন বিকালে আসতেন। আলাপ-আলোচনা করতেন। এই গবেষণার সুদূরপ্রসারী তৎপর্য এই প্রাচীন বৈজ্ঞানিকের কাছে খুবই পরিষ্কার ছিল। তাঁরই অপরিসীম উৎসাহে এই গবেষণা বিদেশী বৈজ্ঞানিক মহলেও আলোচিত হতে থাকলো। বিদেশী বৈজ্ঞানিকেরা এলে তিনি এই গবেষণার বিষয়টি তাঁদের বলতেন, তাঁদের দেখাতেন এবং আমাদের নিয়ে আলোচনায় বসতেন। ডঃ হুমে, ডঃ চেন প্রমুখের কাছ থেকে এই কাজটি প্রশংসা পেয়েছে। দুঃখের বিষয়, এই গবেষণার মধ্যপথে আইন কানুন অনুসারে আমাকে অবসর গ্রহণ করতে হয়েছিল। কিন্তু ডঃ বোসের আরেকটি পরিচয় পেলাম এই সময়ে। তিনি জানতেন বিজ্ঞানীর ছুটি নেই, অবসর নেই। যতদিন তাঁর শারীরিক ক্ষমতা থাকবে, জিজ্ঞাসা থাকবে ততদিন তাঁর ছুটি নেই। অবসর গ্রহণের পর তিনি প্রায় অবৈতনিক গবেষক হিসাবে কাজ চালাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। কঠোরভাবে যিনি নিয়ম-কানুন মেনে চলেন, তিনিই নিয়মভঙ্গ করে দেখালেন, তাঁর যাবতীয় প্রয়াস-চিন্তা হচ্ছে গবেষণার স্বার্থে, গবেষণাগারের স্বার্থে। বিজ্ঞানের স্বার্থে তিনি কঠোর-কঠিন আবার বিজ্ঞানের স্বার্থেই তিনি ব্যতিক্রম ঘটাতে দ্বিধাগ্রস্ত নন।

ডঃ বোস বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে গবেষণার নতুন ধারা প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। তিনি তৈরি করেছিলেন উন্নতমানের একদল বিজ্ঞানী। কাজের অবসরে তিনি ডুবে যেতেন অধ্যয়নে। বসু বিজ্ঞান মন্দিরে যত পত্র-পত্রিকা আসতো সব যেতো আগে তাঁর কাছে। তিনি পড়তেন। নোট নিতেন। তারপর পত্র-পত্রিকাগুলি বা তার অংশবিশেষ পাঠিয়ে দিতেন বিভিন্ন গবেষকদের কাছে। তারপর চলতো আলাপ আলোচনা। আমরা যখন-তখন তাঁর কাছে যেতাম, আলোচনা করতাম, এমন কি তর্কও করতাম ডঃ বোসের সঙ্গে। অথচ দূর থেকে ডঃ বোস ছিলেন মধ্যাহ্নের সূর্য।

৩৩।৩৪ বছরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বহু স্মৃতি জমে আছে, বহু কথা বলার আছে। তাঁর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের দিকটি এক বিরাট অধ্যায়। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেও ডঃ বোসের অবদানের কথা অনেকেই জানেন না।

অখ্যাত এক ভারত পর্যটক—জন জুর্ডেন

নারায়ণ দত্ত

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো পর্যটক বলতে সহজেই যে ছবি আমাদের মনে আসে—যিনি শুধু দেশ দেখতে বা ভ্রমণের উদ্দেশ্য নিয়েই দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান—জন জুর্ডেন তেমন লোক নন। ভারত-ভ্রমণ তাঁর উপরি পাওনা। আসল উদ্দেশ্য-রোজগারের ধান্দা। সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে বহু ঝড়ঝাপটা উপেক্ষা করে' জনকোম্পনীর চাকরীটা নিয়ে জর্ডন পাড়ি জমিয়েছিলেন প্রাচ্যের উদ্দেশে। তখন 'ইষ্টইণ্ডিজ' নামটাই প্রতীচ্যের উত্তোগী পুরুষদের মনে একটা মায়াজাল বিস্তার করত। সে এক অজানা রহস্যময় দেশ। তার তালতমাল নারিকেল বীথির মর্মর ধ্বনি মায়াবিনীর কুহকময়ের মত তাদের ঘরছাড়া করত। সেখানে দারুচিনি বনের মোহময় গন্ধ। সেখানে বালুকা বেলায় যেন সোনা ছড়ানো। টাকাও হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে। শুধু আহরণের অপেক্ষা। কাজেই দলে দলে লোক এই দেশে এই ভারতবর্ষের উদ্দেশে পাড়ি দেবে এ আর বেশী কথা কি?

জন জুর্ডেনও দিয়েছিলেন। তবু সেদিনের সেই গড্ডালিকাপ্রবাহে জন জুর্ডেন একটি বিশিষ্ট নাম। নয়তো তাঁকে নিয়ে আজ গল্প বলার অবকাশই থাকত না। তিনি শুধু অর্থ আহরণের আয়োজনই করেন নি ভারতবর্ষ থেকে তাঁর নিজস্ব চোখ দিয়ে সে সময়ে ভারতবর্ষকে দেখে তার প্রাণ-কেন্দ্র আগ্রা, তার সিংহদ্বার সুরাট তার বিচিত্র রাজ পুরুষের দল, তার সম্রাট, তার নওরোজ উৎসব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত তবু সত্যনিষ্ঠ কিছু বিবরণ, তথ্যনিষ্ঠ ছবি রেখে গেছেন। হয়ত খবরের দিক দিয়ে সেগুলো এমন কিছু নতুন নয়, কিন্তু সমসাময়িক বিবরণগুলি মিলিয়ে যাচাই করে দেখবার জন্য জুর্ডেনের বিবরণের সাহায্য অস্বীকার করা যায় কি করে? সেই ঐতিহাসিক মর্যাদা তো তাকে দিতেই হবে।

আশ্চর্যের কথা সে প্রাপ্য মানও তিনি পান নি। না পাবার কারণ বোধকরি, ঠিক জুর্ডেনের সময়ে বেশ কয়টি মূল্যবান বিবরণ রয়ে গেছে। রয়েছে হকিন্সের বিবরণ, স্যার হেনরি মিডলটনের জর্ণাল, রাল্‌ফ ও উইলিয়ম ফিঞ্চের দিনপঞ্জী এবং সর্বোপরি স্যার টমাস রোর মূল্যবান রোজনামচা। করিয়েটা প্রভৃতি অন্যান্য ছোটখাট লেখার কথা না হয় বাদ দেওয়া গেল। কাজেই জন জুর্ডেনের বিবরণের আর আদর হবে কেন? ভোজবাড়ী ফেলে কে আর গেরস্থবাড়ীর শাকচচ্চড়িতে উদরপূর্তি করতে চায়? শকুন্তলাকে ফেলে কে আর শোনে হংসপদিকার বৃত্তান্ত?

সামান্য হোক, তবু তাই নিয়েই আজকের আলোচনা। কেননা তাঁর জর্ণালের একটা চরিত্র আছে—'His journal is his monument ; and in its candid pages we may easily discern the starling nature of the man', এই জার্ণাল শুরু হচ্ছে, বিলাতে তখন বসন্ত। ঝরঝরে আকাশ। গাছে গাছে শীত অবসানের আনন্দ। দিনরাত সেই গলাগলা বৃষ্টি কুয়াশা, অন্ধকার, গোমরামুখো প্রকৃতি আর নেই। গ্রামেঘরে পাখী ডাকছে। নাইটেংগেল বা স্কাই লার্ক। সেই চৌত্রকরোজ্জ্বল দিনে 'এ্যাসসেনসন' জাহাজের নোঙর উঠল। প্রাচ্যের উদ্দেশে তার শুভযাত্রা। তাতে রয়েছেন চিফ ফ্যাক্টর জন জুর্ডেন। ষোলশ আট সাল। দেশে ফিরেছিলেন দীর্ঘ নয় বছর পর।

এরমধ্যে বছর তিনেক ছিলেন ভারতে। দিল্লীর সিংহাসনে সম্রাট জাহাঙ্গীর। কিছুদিন আগেই ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জেমসের চিঠি নিয়ে এসেছে উইলিয়ম হকিন্স দিল্লীর দরবারে। নিজেকে সম্রাটের রাষ্ট্রদূত বলে পরিচয় দিয়ে দিব্য বহাল তবিয়তে রয়েছে এদেশে। সম্রাট তাকে শিরোপা দিয়েছেন। দিশি মেয়ের সঙ্গে শাদী দিয়েছেন। নতুন উপাধি দিয়েছেন ইংলিশ খান্। কিন্তু দেননি সেটা যার জন্য হকিন্সের দিল্লী যাত্রা। দেননি সুরাটে কুঠি বানবার সনদ বা সারারাজ্যে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার ফরমান। দুটোই সমান দুর্লভ। মরীচিকার মত ইংরেজ ব্যবসায়ীদের তৃষ্ণা শুধু বাড়িয়েই চলেছে-মেটাবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

এমনি যখন অবস্থা—হকিন্সের আসবার প্রায় বছর খানেক পরে—জন জুর্ডেন নামে প্রায় চল্লিশ বয়স এক ইংরাজ ফ্যাক্টর ভারতের মাটিতে পা দিলে। জুলাই ষোলশ নয়। ভারতবর্ষে এলে কি হবে জুর্ডেনকে আগ্রা পৌছতে প্রায় বছর দুই সময় ব্যয় করতে হয়েছিল এবং আগ্রা যখন পৌছলেন, হকিন্সের তখন খুবই দুর্যোগ চলেছে। অবশ্য মুঘল 'ব্যুরোক্রোসি' বড় বিচিত্র বস্তু। তার মর্জি পাওয়া ভার। হকিন্স যে পাননি সেটা কোন বড় খবর নয়। অমন যে দুঁদে ব্রিটিশ রাজপুরুষ স্যার টমাস রো—বলতে কি ইংলণ্ডের বেশ উঁচু মহলের খানদানী লোক—তিনিও প্রকারান্তরে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরেছিলেন এখান থেকে, তা উইলিয়াম হকিন্স কোন ছার!

জন জুর্ডেন তাঁর রোজনামচায় লিখছেন, তিনি যখন আগ্রা পৌছলেন, হকিন্সের তখন খুবই বেসামাল অবস্থা। 'At my comeinge to Agra, I was presentlie imformed that Captaine Hawkins was in some disgrace with the kinge for three causes,' এইটি তিনটি কারণও চিত্তাকর্ষক, কেননা এ থেকে বোঝা যায় মুঘল 'বুরোক্রেসির' কার্যকলাপ কি বিচিত্র খাতেই না বইত! সুরাটের কাসটম্‌স্ অফিসার ও কাম্বের শাসনকর্তা মুকাবর খাঁ হকিন্সের জাহাজ থেকে বেশ কিছু পরিমাণ কাপড়চোপড় কেনেন। অবশ্য পরে পশ্চাতে দাম দেবেন এই কড়ারে। এখন হকিন্স সেই টাকাটা বার বার তাগাদা দিয়ে যখন পেলেন না, সোজা একদিন সম্রাট জাহাঙ্গীরের কানে তুলে দিলেন। সম্রাট শুনেই তাঁর চিফ সেক্রেটারী খাজা আবুল হাসানকে ডেকে পাঠিয়ে টাকাটা যাতে হকিন্স অবিলম্বে পেয়ে যায় তার ব্যবস্থা করতে বললেন। মুকাবর খাঁর চোখ কপালে ওঠবার দাখিল। কিম্ আশ্চর্য্যং অতঃপরং! তিনি সুরাট বন্দরের শুল্কের হর্তাকর্তা তিনি জাহাজ থেকে কিছু কাপড় নিয়েছেন—তার কিনা দাম চায় ফিরিঙ্গীর বাচ্ছা? কিন্তু করবেনই বা কি? আবুল হাসানও পরামর্শ দিলেন, ভায়া হে, সম্রাটকে যখন বলেছে, একটা রফা করে ফেল, নয়তো অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াতে পারে। মুকাবর খাঁ একগাল হেসে হকিন্সকে বললে, আরে বলেছি তোমায় টাকা দেব না? এই নিয়ে তুমি সম্রাটকে বলতে গেলে? ছুঁচোর বিষ্ঠা পর্বতে? দোব দোব টাকাটা শীঘ্রই দিয়ে দেব। মিথ্যা ভাবনা!

এ'হচ্ছে বড়লোকের দেনা। শুধতে সময় লাগে। আজ দিচ্ছি-কাল দিচ্ছি করতে করতে একদিন মুবারক খাঁ বলে বসলেন তাঁর দেয় টাকার প্রায় সিকি ভাগ তিনি দেবেন না কেননা, সেটা তাঁর ভাই কিনেছে; এবং সেই কাপড়ের জন্য এমন সব দাম চাওয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত চড়া। হকিন্স একগুঁয়ে ইংরেজ তারওপর স্বয়ং সম্রাট তাঁর মুরুব্বি, বলেন ওসব হবে না। আমার পাওনা

পুরোটাই উসুল চাইই। মুকাবর খাঁ সাফ্ হাকিয়ে দিলে যা দিচ্ছি নেবে ত নাও, নয়তো পথ দেখ।

হকিন্স নাছোর বান্দা। আবার সম্রাটের কানে ব্যাপার তুললে। সম্রাট ত রেগে আগুন, তেলে বেগুন! আবুল হাসানকে বললেন ক্রুদ্ধকণ্ঠে এক্ষুনি যেন হকিন্সের টাকাটা মিটিয়ে দেওয়া হয়। হাসান হকিন্সকে ডেকে পাঠালেন তাঁর বাড়ীতে। যে টাকাটা মুকাবর খাঁ দিতে চেয়েছিলেন সেটা তাঁর হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, যা দিচ্ছি সুড় সুড় করে নিয়ে যাও। যদি বেগড়বাই করো, ফল ভাল হবে না! দেখা গেল, এতকালের অনুনয় বিনয়ে যে কাজ হয়নি, আজকের রক্তচক্ষু সেই কাজ অবলীলায় করে দিলে! হকিন্স সুড় সুড় করে টাকাটা নিয়ে বিদায় হ'ল। একই সঙ্গে তার পাওনা টাকার চৌথ চলে গেল আর গেল আবুল হাসান আর মুকাবর খাঁর শুভেচ্ছা! দুর্গ্রহ আর কাকে বলে!

এদিকে হকিন্সকে যেদিন সম্রাট ইংলিস খাঁ খেতাব দিয়েছিলেন, সেদিনই আবুল হাসানকে বলে দিয়েছিলেন হকিন্সকে একটা ছোটখাট জায়গীর দিতে। এখন ঐ ঘটনার পর জায়গীরের কথা আবুল হাসান আর কর্ণপাতই করেন না। 'Nowe Captaine Hawkins looks for his land which the King had promised him, and cannot be without the ayde of Abdelasan, which when Captaine Hawkins come to speake tohim about, he would hardly afford to speake with him, bult att length he told him that there was nothinge for him, beinge a marchant, he might plye his marchandizinge and not look for anything at the King's hands,…' অর্থাৎ তুমিও বাপু বেনে ব্যবসা করে খাও, তুমিত আর সত্যি রাজপুরুষ নও যে রাজার হাত থেকে জায়গীর পাবে। আবুল হাসান আরও বলেছিল, বাপু হে, তুমি যে বেনে সে খবর স্বয়ং সম্রাটের কাছে পৌচেছে। এবং সে খবর পৌছে দিয়েছেন সম্রাটের মাতাঠাকুরাণী। বিয়ানায় নীল কিনতে গিয়েছিল রাণীমার জাহাজ। সেখানে শোনে সেখানকার সব নীল তোমারই ফ্যাকটর ফিঞ্চ (বিখ্যাত William Finch) কিনে ফেলেছ। রাণীমা অনেক সাধ্যসাধনা করে মাত্র এক বাকস পেয়েছেন।

কিন্তু মুঘল ব্যুরোক্রেসির কোপ এত সহজেই প্রশমিত হয়নি। আরও নাস্তানাবুদ করেছিল হকিন্সকে! সম্রাট জাহাঙ্গীর নিজে মদ্যপ হলেও তাঁর সভাসদরা কেউ উগ্র মদ্যপান করে দরবারে আসুক, এটা তিনি পছন্দ করতেন না। কাজেই তিনি একটা ফরমান জারী করে দিলেন সেইমত। কিন্তু হকিন্সত ফার্সী ফারমানের মানে বোঝেন না। আর মদ্যপানের অভ্যাস ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। যথা নিয়মে একদিন তিনি প্রভূত মদ্যপান করে দরবারে গেছেন, আর আবুল হাসান তাকে একবারে খোদ সম্রাটের কাছে নিয়ে হাজির করলে। তার মুখ দিয়ে তখন কড়া মদের গন্ধ ভুর ভুর করছে। সম্রাটের ব্যাপারটা বুঝতে কষ্ট হল না। বিদেশী লোক। সম্রাট তাকে বাড়ী যেতে বললেন। আর ভবিষ্যতে মদ্যপান করে সভায় আসতে নিষেধ করে দিলেন! বারণ করে দিলেন সম্রাটের কাছে দাঁড়াতে। মুখচোখ লাল করে অপমানিত হকিন্স সভা ত্যাগ করলেন। আবুল হাসানের ক্রুর চোখে বিচিত্র একটা হাসি খেলা করে গেল।

এই সব ঘটনার পাশে পাশে জুর্ডেন সিংহের মুখ থেকে জাহাঙ্গীরের প্রাণরক্ষার কাহিনীটাও

বলে নিয়েছেন। বলেছেন তাঁর আমদরবারের কথা, প্রতিদিন চারঘন্টা। জুর্ডেন লিখেছেন: After the King's cominge to the cittee, having rested himselfe two or three daies, he began to sit abroad as he was accustomed, four howers every daie haer all mens cawses, two howers in the forenoone and two howers in the afternoone. The rest of the daie he employath in seeing elephants to fight, and other sports···এই খেলার কথা বলতে গিয়েই জন জুর্ডেন জাহাঙ্গীরের সিংহের সঙ্গে মানুষের লড়াই-এর গল্প বলেছেন। বেগম সাহেবারাও নাকি চিকের অন্তরাল থেকে এই কদর্য খেলা দেখতেন। জুর্ডেন একটা গল্প বলেছেন। একবার একজন দুর্ধর্ষ পাঠান জাহাঙ্গীরকে এসে বললে, সম্রাট আমাকে একহাজারী মনসবদার করে দিন। এক প্রচণ্ড কৌতুক খেলা করে গেল সম্রাটের চোখে, কেন? এমন কি বীরত্ব আছে তোমার যাতে তোমাকে মনসবদার করে দেব? সাধারণ মানুষের সঙ্গে তোমার তফাৎ কি? তুমি কি থালি হাতে সিংহের সঙ্গে লড়তে পার?

পাঠান বুক ফুলিয়ে বললে, আলবাৎ। জান কবুল।

সম্রাট এক ক্ষুধিত সিংহকে ছেড়ে দিতে বললেন।

মানুষ সিংহের সেই কদর্য লড়াইয়ে মানুষই জিতল সেদিন, কিন্তু নিতান্ত অল্পকালের জন্যে! বিজয়গৌরবে উদ্দীপ্ত সেই পাঠান, ক্ষতবিক্ষত দেহ সেই পাঠান, কিছুক্ষণের মধ্যেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আর উঠল না! এই গল্প জন জুর্ডেন একাই বলেননি। হকিন্সও তাঁর বিবরণে এই কাহিনী জুড়ে দিয়েছেন। এবং মানুষ-সিংহের লড়াই প্রসঙ্গেই এসে পড়েছে সিংহের মুখ থেকে জাহাঙ্গীরের আত্মরক্ষার ঘটনা।

শিকারের নেশা জাহাঙ্গীরের মতই তীব্র ছিল জাহাঙ্গীরের কাছে। একবার এক মৃগয়ায় ঘুমন্ত এক সিংহকে দেখে বন্দুক ছোড়েন। আহত সিংহ জেগে উঠে সম্রাটকে আক্রমণ করে এবং সেই আক্রমণের সামনে দাঁড়ায় এক রাজপুত অনুপ রায়। অনুপ অবশ্য মারাত্মকভাবে আহত হয় কিন্তু বেঁচে যায়। তার দেহে আঘাতের সংখ্যা ছিল বত্রিশটি। সম্রাট তাঁকে পাঁচ হাজারী মনসবদার করে দেন। তাঁর খেতাব দেন অনিরায় 'সিংহদলন' আর একটি তরবারি। তুজুক-ই জাহাঙ্গীরীতেও এই কাহিনী আছে। আছে ফিঞ্চের বর্ণনায়। আছে স্যার টমাস রোর জার্ণলে। ফিঞ্চের হিসেবে তারিখটা হচ্ছে ছয়ই জানুয়ারী, ষোলশ এগার।

জন জুর্ডেনের বিবরণে অন্তত একবারের জন্যও বাঙলাদেশ এসেছে। তিনি বলেছেন, বছরে দশহাজার টনের মত লবণ আসত আগ্রা থেকে বাঙলা। যমুনা হয়ে। জলপথে। এক একটা মাল নৌকায় চার থেকে পাঁচশ টন লবণ ধরত। নৌকাগুলো বেশ লম্বা। চওড়া ও মজবুত। আগ্রা তখন প্রাসাদনগরী। প্রত্যেক আমীরের বাড়ীর চারিদিকে তার অধীনস্থ লোকেরা থাকত। সম্রাটের মহলে প্রতি চব্বিশ ঘন্টা অন্তর প্রহরী পরিবর্তন হত। পাহারা দেবার কালে হাতীদেরও ব্যবহার করা হত। তারা এত শিক্ষিত ছিল যে সম্রাট এলেই শুঁড় তুলে শাহেনশাকে সেলাম জানাত। যা' না ছিল আগ্রায়, তা' না ছিল ভারতে। এমনি তখন আগ্রার সমৃদ্ধি। সারা শহরে সব সময়েই যেন মেলা বসেছে। অতিথি অভ্যাগতদের জন্য প্রচুর ভালো ভালো সরাই ছিল আগ্রায়। সন্ধ্যার

যবনিকা দিকচক্রবালে ঢাকা পড়তেই সরায়ের দরজা যাতায়াতের জন্য বন্ধ হয়ে যেত। তখন কেবল প্রহরীর ইচ্ছেই 'সুপ্রিম অথরিটি'! সেকালের জন জুর্ডেনের আগ্রায় পাঁচ ক্যারেটের বেশি ওজনের কোন হীরের বিক্রি ছিল নিষিদ্ধ। সম্রাট জানতে পারলে গর্দান যাবে। কাজেই ওর বেশি ওজনের হীরে সাদা বাজারে বিক্রি হত না! সম্রাটের জন্য জানোয়ারদের জন্য মাংসই নাকি লাগত প্রত্যহ সত্তর হাজার টাকার! আর মুঘল হারেমের কাহিনী বলতে গিয়ে বলেছেন: 'His wives, there slaves, and his concubines doe spend him an infinite deal of money, increvedible to be believed, and therefore I omit it.' ভালোই করেছেন!

জন জুর্ডেনের কি কখনও সম্রাট সদর্শন ঘটেছিল? হ্যাঁ। জন জুর্ডেন পাকড়েছিলেন খাজা জাহানকে মুরুবি। খাজা জাহানের দৌত্যে একদিন স্বয়ং সম্রাটের সঙ্গে তাঁর ভেট হয়ে গেল। রাজসকাশে তিনি আগ্রা থেকে পায়ে হেঁটে সুরাট ফেরও যাবার ফরমান চাইলেন, বললেন তাঁদের দুঃখের বারমাস্যা, জাহাজ নষ্ট হয়ে গেছে—এই শহরেই ত কাটল পাঁচমাস এখন যা' মালপত্র জোগাড় হয়েছে তার জন্য যেন আবার শুল্ক না চেয়ে বসে মুঘল কাষ্টমস্!

জাহাঙ্গীর নাকি অভয় দিয়ে বলেছিলেন তাঁর দেশে এরকম ফরমান দরকার হয় না, তবু যখন তারা চলেছে, তিনি ফরমান দিয়ে দেবেন। সম্রাট রাজী হয়েছে শুনেই ইংরেজ ফাষ্টরেরা দুই হাঁটু গেড়ে মাটিতে মাথা ছুঁয়ে মাটির ধুলো তিনবার মাথায় ছুঁইয়ে তসলিম করল। খাজা জাহান এই মুঘল আদব কায়দায় তাদের তালিম দিয়ে রেখেছিলেন। এরপর জাহান খাঁ সাহেব ইংরেজদের ইঙ্গিত করতেই তারা সম্রাটের আরও কাছে এগিয়ে এসে ইংলণ্ডের রাজার মুখাঙ্কিত একটা স্বর্ণমুদ্রা সম্রাটের হাতে দিলেন। সকৌতুকে সম্রাট এই মুদ্রাটি নিরীক্ষণ করলেন এবং একসময়ে সেটি পকেটস্থ করলেন অম্লানবদনে। জাহাঙ্গীরের 'কিউরিও' প্রীতি এমনি আজব ব্যাপার ছিল!

এ প্রসঙ্গে আরও একটা গল্প বলা হয়েছে। একবার এক রাজকর্মচারী সুদূর চীন থেকে আনা নক্কাকাটা একজোড়া ডিশের একটি অসাবধনতাবশতঃ হাত থেকে ফেলে দিয়ে ভেঙে ফেলে। খবরটা সম্রাটের কানে উঠতেই সম্রাট ত একেবারে দারুণ রেগে গেলেন। সেই রাজকর্মচারীকে ডেকে এনে সকলের সামনেই চাবকাতে সুরু করলেন। তারপর তাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে বললেন সে যেন অনতিবিলম্বে চীনদেশের উদ্দেশে যাত্রা করে যতদূর সম্ভব শীঘ্র নতুন একখানা ডিশ কিনে নিয়ে এসে জোড়া মিলিয়ে দেয়, নয়তো তার আস্ত থাকবে না। জাহাঙ্গীরের 'কিউরিও' প্রীতির বহু গল্প স্যার টমাসরোর জর্ণালে আছে—কাজেই এই কাহিনীগুলি আমাদের পরিচিত জাহাঙ্গীর বাদশার ছবিটি আজও উজ্জ্বল করে তোলে মাত্র।

এই ঘটনার পরই জুর্ডেনের আগ্রাপর্বের পরিসমাপ্তি। পায়ে হেঁটে সুরাট। আসবার সময় তিনি এসেছিলেন কুমবারিয়া, কারোঞ্জ, ভিয়ারা, মোটা, নারায়নপুর, অধৈতা, ভাদোয়ার, নীমগান, সিন্ধখেরা, খালনের চোপরা, আরাচাদ, যওয়ান, রভের, বাহাদুরপুর, কুরহানপুর, আসীর, ফারগাঁও, খরগাঁও, বলুথর, আকবরপুর, মাণ্ডু, লুনেরা, দীপলপুর, উজ্জয়িনী, কানাসিয়া, সুনেরা, সারঙপুর, শিরঞ্জ, কাঁকনের সরাই, শাহদুরা, কালবাগ, কৈলারস, শিপ্রী, নরওয়ার, ভীতরওয়ার, আম্বি, গোয়ালিয়র, ঢোলপুর, শিকান্দ্রা হয়ে আগ্রা। পথে তিনি অতিক্রম করেছেন খালনায়ের কাছে

তাপ্তির খরস্রোত বলঘর আর আকবরপুরের মাঝে নর্মদা, লুনেরা আর দীপলপুরের মাঝে এবং উজ্জয়িনী এবং সুনেরার মাঝে চম্বলের দুই শাখানদী একটি তো বিখ্যাত কালিদাসের শিপ্রা—সারঙপুরের কাছে কালীসিন্ধু নদী আর গোয়ালিয়র ও ঢোলপুরের মাঝে মুল চম্বলকে। ফেরার পথ কিরাওলি, ফতেপুর সিক্রি, বিয়ানা এখানে সেকালে উৎকৃষ্ট নীল তৈরী হত—হিন্দৌন, লালসই, জামপাদা, চাকসু, লাদানা, মোজাবাদ, কুচিল, আজমীর, গরাও, মেরতা, ঘোষপুর, দুন্দারা, থাওণ, ভারওয়ানি, জানস, মোদরা, ভীনমন, সামি, সংকলপুর, সাদরা, হাজিপুর, সরখেজ, আহমেদাবাদ, কামবে, সরোদ, বরোচ হয়ে সুরাট। সেকালের খান্দেশ, রাজস্থানের মালব মারবার, গুজরাট ও উদয়পুর এই কয়েকটি প্রদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল জন জুর্ডেনের ভারতভ্রমণ। সুরাট থেকে কুরহানপুর এবং সেখান থেকে উজ্জয়িনী মোটামুটি এই পথেই বছর কয়েক পরে স্যার টমাস রোও গিয়েছিলেন। তারপরেই এঁদের পথ আলাদা, কেননা, জাহাঙ্গীর তখন আজমীড়ে শুনে রো রনথমভোর হয়ে সোজা আজমীঢ় চলে যান।

কিন্তু জুর্ডেনের ভারতভ্রমণ বৃত্তান্ত স্থগিত রেখে আসুন আমরা জনের ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে একটু খোঁজখবর নিয়ে নিই। তাঁর জন্মদিন সঠিক না জানা গেলেও পণ্ডিতরা মনে করেন তাঁর জন্ম পনেরশ' বাহাত্তরের শেষাশেষি কিংবা পরের বছর। বাবার নামও জন জুর্ডেন। ইংলণ্ডের ভরসেট সায়ারের ছবির মত বন্দর শহর লাইম রেগিসের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ষষ্ঠ সন্তান ও চতুর্থ পুত্র জন। ছোটবেলা সম্বন্ধে তাঁর কিছুই জানা যায় না কেবল কল্পনা করা যায় বাচ্ছা বাচ্ছা একদঙ্গল ছেলেমেয়েদের সঙ্গে জনও হয়ত ব্ল্যাকমেরী তুলতে গেছে, কিংবা পাখীর বাসার সন্ধানে গাছে গাছে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিংবা হয়ত একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে নোঙ্গর তুলে ভারী জাহাজগুলো কোন দূর বন্দরের উদ্দেশে পাড়ি জমাচ্ছে; কিংবা 'য়ুনিয়ন জ্যাক' পতাকা সগর্বে উড়িয়ে অজস্র মানপত্র নিয়ে লাইমের জলে নোঙ্গর ফেলছে। কখনও শান্ত সমুদ্রে আঁকা ছবির মত জাহাজগুলো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, কখনও ক্ষুব্ধ সমুদ্র স্রোতে মোচার খোলার মত সেগুলি কেবল দুলছে আর দুলছে। আর কিশোর জনকে যেন বার বার সুদূরের হাতছানি দিয়ে যাচ্ছে। ড্রেক, হাওয়ার্ডের হাতে পর্যুদস্ত স্প্যানীস আরামাডার ছবিও তাঁর মনে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার করে থাকতে পারে।

পনেরশ' অষ্টআশি সালের হেমন্তকালে জনের বাবা তখন তিনি শহরের মেয়র, যখন মারা যান তখন জনের ভাগ্যে জুটল একটি লিজ নেওয়া বাড়ী, কাছেই একটা আপেলের বাগান, এবং বাকী সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ। যে বাড়ীতে তিনি মানুষ সেটি পান তাঁর সবচেয়ে ছোট ভাই চারলস এবং তাঁর মা পান সেই বাড়ীতে বিনাভাড়ায় থাকবার অধিকার। ষোল শ' পনের সালের ডিসেম্বরে বাড়ীটি মরগেজ থেকে হস্তান্তরিত হবার যখন উপক্রম হয় তখন জন জুর্ডেনই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে দেড়শ' পাউণ্ড ধার নিয়ে সেটিকে বাঁচান। ছোটভাই চারলস শেষে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

যতদূর জানা যায়, জন জুর্ডেন নিজেই ছোটখাট জাহাজ নিয়ে পর্তুগীজদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে সুরু করেন তখন তাঁর বয়েস বিশ-বাইশ। প্রায় এই সময়েই সুসান বলে স্থানীয় একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। একটি ছেলে। তার নামও জন। কিন্তু অচিরে এই স্বাধীন ব্যবসা ছেড়ে জন কোম্পানীর দাসখত লিখে দেন। বোধকরি কোম্পানীর চাকরিতে ব্যক্তিগত ব্যবসা

অবাধে চলত এই সংবাদ জন জানতেন। কাজেই চাকরি করতেই বা দোষ কি? না, নিজের ব্যবসা ভালো চলছিল না জনের? কিংবা আর কিছু একান্ত ব্যক্তিগত? স্ত্রী সুসানের সঙ্গে সম্বন্ধ ভালো ছিল না জনের, অন্ততঃ তাঁদের সম্বন্ধ যে তিক্ত হয়েছিল, তার প্রমাণ জন তাঁর উইলে কিছুই রেখে যাননি তাঁর স্ত্রীর জন্যে। পারিবারিক অশান্তি কি জনের সমুদ্র যাত্রার কারণ? কে জানে?

কারণ যাই হোক না কেন, ষোল শ' সাতের শেষাশেষি জনকে দেখা গেল জন কোম্পানীর লিডেলহল ষ্ট্রীটের দোতলা বাড়ীটার করিডরে ঘোরাঘুরি করতে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন লোক নিচ্ছে। ঐ বছরের চব্বিশে নভেম্বরের এক সভার বিবরণে দেখা যাচ্ছে যে যে নাম জাহাজের জেনারেল আর প্রধান কুঠিয়ালের পদের জন্য মনোনীত করা হয়েছে তার মধ্যে জন জুর্ডেন অন্যতম। সাতই ডিসেম্বর জনের চাকরি হয়ে গেল। মাইনে মাসিক তিন পাউণ্ড। জামাকাপড়ের জন্য এ্যালাউএন্স আরও দশ পাউণ্ড। জন যে সমুদ্রযাত্রার জন্য চাকরি পেলেন সেটি চতুর্থ। দুটি জাহাজ যাবে একটি প্রথম ও দ্বিতীয় সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ জাহাজ 'এ্যাসসেনসন অপরটি আনকোরা নতুন—ইউনিউন। জেনারেল হলেন আলেকজাণ্ডার শার্পিলেগ ষোলশ আট চৌদ্দই মার্চ জনের জাহাজ উনউইচ বন্দর ত্যাগ করল।

কিন্তু হা হতোস্মি মন্দভাগ্য! দু'বার সমুদ্রযাত্রায় ঘুরে আসা জাহাজ 'এ্যাসসেনসন' এ'বারে আর দেশে ফিরে গেল না। মাত্র এডেন ঘুরে ভারতবর্ষের তীরভূমি থেকে পনের 'লীগ' দূরে জাহাজটার সলিলসমাধি ঘটে গেল। তার আগে অবশ্য এডেনে কিছু ব্যবসা করেছেন আলেকজাণ্ডার শার্পিলেগ। জন জুর্ডেন যথেষ্ট সাহস দেখিয়ে সা'নায় পাশার সঙ্গে মুলাকাৎ করে' সে-যাত্রায় তাঁদের মালপত্রের ওপর থেকে শুল্ক সব রেহাই করিয়ে এনেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে তাঁদের জাহাজ আর পৌঁছল না! ডুবন্ত জাহাজ থেকে নৌকা ভাসিয়ে শার্পিলেগ প্রভৃতিরা তীরে গিয়ে উঠলেন এবং একদা তাদের সাক্ষাৎ হয়ে গেল উইলিয়ম ফিঞ্চের সঙ্গে। ইনি এর আগের সমুদ্রযাত্রায় এসেছিলেন সুরাটে। এবং তাঁর হাতে মালপত্র জমা দিয়ে 'হেকটর' জাহাজের জেনারেল হকিন্স স্বয়ং চলে গেছেন আগ্রায়—সম্রাট সন্দর্শনে। এবং সেখানে বেশ খানিকটা জাঁকিয়ে বসেছিলেন। হকিন্স 'তুর্কী' ভাষা জানতেন। এবং সেটা তাকে ভারী সাহায্য করেছিল। কিন্তু হকিন্সের দৌত্য যে বিশেষ সফল হয়নি—সেত আজ আর কারও অজানা নয়। তাঁর ব্যবহার মুঘল 'বুরোক্রেসি'কে শত্রু করে তুলেছিল, সে গল্পত আগেই বলা হয়েছে। এ'দিকে সম্রাট ভেবেছিলেন ইংরেজদের যে নতুন জাহাজ আসছে তাতে নিশ্চয়ই নতুন কিছু বিচিত্র জিনিষপত্র আসবে তাঁর নজরানার জন্যে। কিন্তু জাহাজ যখন এল না, তার পরিবর্তে এল কতকগুলি বিশ্বস্ত চেহারার ইংরেজ নাবিক—জাহাঙ্গীর ইংরেজদের সম্বন্ধে বীতরাগ হয়ে পড়লেন। তা'ছাড়া ইংরেজদের জাতশত্রু পর্তুগীজরা, জেসুইট ফাদারদের, সেই আকবরের আমল থেকেই মুঘল দরবারে একটা জোর 'লবি' ছিল, তারাও প্রচ্ছন্নভাবে ইংরেজদের প্রতিকূলতা করছিল। এমনি সময়ে হকিন্স সুরাটের কুঠিয়াল উইলিয়ম ফিঞ্চকে আগ্রায় ডেকে পাঠালেন। ফিঞ্চ জুর্ডেনকে পেয়ে তাঁকে সব মালপত্র বুঝিয়ে দিয়ে আগ্রায় ছুটলেন। মালপত্র তখন সুরাটে কুঠীতে সামান্যই। সেগুলি বিক্রি করে এক সময় জন জুর্ডেনও আগ্রা গেলেন।

সেখানের সাড়ে পাঁচ মাসের গল্পত আগেই সারা। নাটকটা কিন্তু জমলো ফিরে এসে। তাঁরা

যখন আমেদাবাদ হয়ে ক্যাম্বেতে, গভর্ণর মুকাবর খাঁ এত্তেলা পাঠালেন তাঁদের কাছে। কিছু ভালো খবর আছে। কি? না, সার হেনরি মিডলটন সুরাট উপকূল পৌঁচেছেন। আরও তাজ্জব কি বাত, মুকাবর খাঁ ইংরেজদের জন্যে সুরাট যাবার পাল্কীর আয়োজন করে দিলেন! আরামে দুলতে দুলতে, ঘুমতে ঘুমতে তাঁরা একদিন সুরাট পৌঁছে গেলেন! সুরাটেও পৌঁছলেন কিন্তু ইংরেজ জাহাজে যাবেন কি করে?

এদিকে মিডলটনের কী হল? সুরাটের উপকূলে তিনি পৌঁচেছেন ঠিকই; কিন্তু সুরাট অনেক দূর। পর্তুগীজরাও খবর পেয়েছিল। তারা সুরাটের উপকূল বরাবর থানা বসিয়ে দিল। সামনে পর্তুগীজ যুদ্ধজাহাজ। সারা তীরে তীরে সশস্ত্র পর্তুগীজ পাহারা। কোন ইংরেজ নৌকা এলেই তো গুলি। তাহলে? দিনের পর দিন জাহাজে জল, খাবার কমে আসছে। টাটকা খাবারের অভাবে নাবিকেরা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। অথচ মিডলটন আখির দেখতে চান। অত্যন্ত জেদী মানুষ তিনি। সুরাটের বন্দরে যে মাল নামাবার কথা, তা' তিনি অন্য কোথাও নামাবেন না। পর্তুগীজ কাপ্তেনকে চিঠি লেখেন তিনি। তার সাফ জবাব—জোর যার মুলুক তার। এখানে আমাদের মৌরসী পাট্টা সুরাটে ইংরেজদের নামতে দেব না। স্থানীয় অধিবাসীরা পর্তুগীজ-ভয়ে তটস্থ। কোন ঝামেলার মধ্যেই যেতে চায় না। মিডলটন এসেছেন এখানে ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর, ষোলশ' এগার। দিন যায়। পক্ষ ঘুরে আসে। সুরাটের তীরভূমি তেমনিই 'দূর অস্ত'।

আশ্বিনের সকাল। সমুদ্রতীরে কাঁচাসোনা গলে পড়ছে। পর্তুগীজদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া একটা ছোট্ট 'ফ্রিজেটে' দাঁড়িয়ে মিডলটন সুরাটের তীরভূমির দিকে অতৃপ্তনয়নে তাকিয়েছিলেন। এমন সময়ে দেখলেন দূরে বালি পাহাড়ে পাগড়ীর কাপড় উড়িয়ে কে যেন কী সঙ্কেত জানাচ্ছে। মিডলটন তৎক্ষণাৎ একটা নৌকা পাঠালেন। নৌকাটা তীরের কাছে পৌঁছতে না পৌঁছাতে মাঝিরা সবিস্ময়ে দেখলে গুজরাতী পোষাকপরা এক সাহেব। সাহেব আর কেউ নয় এই গল্পের নায়ক—জন জুর্ডেন। নৌকা তীরে যাবার তর সইল না জুর্ডেনের। হাঁটু পর্যন্ত ভিজিয়ে জলে নেমে তিনি সাত তাড়াতাড়ি নৌকায় এসে উঠলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিডলটনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়ে গেল। পর্তুগীজ প্রহরীদের চোখে ধুলো দেবার জন্যই তাঁর এই ছদ্মবেশ। 'পেপার কর্ণ' জাহাজের কেবিনে বসে জুর্ডেন মিডলটন সাহেবকে একটা অত্যন্ত জরুরী খবর দিলেন। বললেন, ঠিক সুরাটের অদূরে ছোটখাট একটা বন্দরের মত জায়গা আছে যেখানে ছোট ছোট জাহাজ বা নৌকা অক্লেশে ঢুকতে পারে। জুর্ডেন আরও বললেন, এ' খবর তাঁকে দিয়েছেন সুরাটের শাসনকর্তা খাজা নিজাম এবং তার বিশ্বাস খবরটা উড়িয়ে দেবার মত নয়। মিডলটন কিন্তু জুর্ডেনের খবরটা না গ্রহণ, না বর্জন করলেন। অন্য সব পন্থা বাজিয়ে দেখতে লাগলেন। এর মধ্যে বার ছয়েক সুরাটের শাসনকর্তার সঙ্গে দেখাও করে এলেন। দেখলেন, তিনিও পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে সমান অসহায়। তিনি ইংরেজদের বললেন, সুরাট ছেড়ে কোথায় গিয়ে জাহাজ ভেড়াতে। সেখানে অবাধে ব্যবসা করতে পারবেন। মিডলটন ভাবলেন যে তাই করি। করলেনও। কিন্তু ফল হ'ল না। কেন না, আসলে তিনি ভেবেছিলেন তিনি চলে গেলে পর্তুগীজরাও পাহারা তুলে নেবে। কিন্তু নিল না। মিডলটন আবার পুরনো জায়গায় ফিরে এলেন। এদিকে 'এ্যাসসেনশন' জাহাজের পথহারা নাবিকেরা মায় জেনারেল

শার্পিলেগ পর্যন্ত একে একে 'পেপারকর্ণ' জাহাজে এসে উঠলেন। কিছু একটা করতেই হয়। কতদিন আর এমনি ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় থাকা যায়?

এই সময়েই মনে পড়ল জুর্ডেনের কথাটা। এবং কিছু খোঁজাখুঁজি করতেই বেড়িয়ে পড়ল জায়গাটা। বিখ্যাত 'সোয়ালি হোল' (Swally hole)। ছয়ই নভেম্বর সেখানে গিয়ে ভিড়ল ছোট ইংরেজ জাহাজ 'ট্রেডস্ ইনক্রিজ' এবং পর্তুগীজদের সব চাল বানচাল হয়ে গেল। কাছেই সুন্দর পানীয় জল। কাছেপিঠে গ্রাম থেকে দলে দলে মানুষ এসে তাদের কাছে ভেড়া-ছাগল প্রভৃতি খাদ্য-সামগ্রী বিক্রি করতে লাগল। 'পেপার কর্ণের' লোকলস্কর যেন নবজীবন পেল। পর্তুগীজরা পল্টা ব্যবস্থা হিসেবে চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালাতে লাগল; কিন্তু তখন ইংরেজদের মনে নবীন উৎসাহ, তাদের সঙ্গে পেরে উঠবে কেন অন্য কেউ? একটা ছোট-খাট লড়ায়ে পর্তুগীজদের একেবারে তুলোধুনে দিলেন মিডলটন। পর্তুগীজরা আবার গিয়ে দিল্লীর দরবারের দ্বারস্থ হ'ল।

কিন্তু পৃথিবীতে শক্তের ভক্ত কে নয়। যখন দেখা গেল ইংরেজরা বেশ লড়াকু জাত মুঘল মনসবদারেরা সমীহ করে চলতে লাগল। মুকাবর খাঁ কাছে থেকে ভায়ের কাছে এসে একদিন মিডলটনের সঙ্গে দেখা করে গেলেন শুধু নয়, সারা রাতটা কাটিয়ে গেলেন ইংরেজ জাহাজে। 'ট্রেডস ইনক্রিজের পাটাতনে। বেশ কতগুলো মজাদার খেলনা সংগ্রহ করে নিয়ে গেলেন। একটা 'বীভার হ্যাট', একটা গন্ধবহ 'জারকিন' আর এক 'স্পেনিএল' কুকুরের বরাত দিয়ে গেলেন মিডলটনের কাছে। তিনি গেলেন ত খাজা নাজির এলেন। অনেক কথাবার্তা হল। কেবল হ'ল না শুধু সেই বহু অপেক্ষিত আলোচনা সুরাটে ইংরেজ কুঠী স্থাপনের কথাটা। এদিকে দিল্লীর হুকুমে মুকাবর খাঁকে কাম্বের শাসনকর্তার পদ থেকে অপসারিত করা হ'ল, যদিও সুরাটের কাস্টমস অফিসারের চাকরিটা তাঁর রইল। মুকাবর খাজা নাজিমকে ঠেকিয়ে দিয়ে গেলেন এবং কথামত ইংরেজ জাহাজে আনা সীসা ওজনের জন্যে নিয়ে আসা হ'ল সুরাট বন্দরে। এবং এই সীসা ওজনের সময়েই বেঁধে গেল ধুন্ধুমার।

এদেশের ওজন ইংরেজ ওজনের চেয়ে বেশি। ইংরেজেরা বলে না তারা বেশি দেবে না। খাজা নিজাম রেগে গিয়ে বললে, মাল ওঠাও। ব্যবসা হবে না। কুটিয়াল হিসেবে জন জুর্ডেন মাপজোপ দেখিয়েছিলেন। স্যার হেনরি মিডলটনও বসে ছিলেন। তিনি ত রেগে গিয়ে বললেন, ভেবেছে কি মুঘলরা। সঙ্গে সঙ্গে খাজা নাজিমকে চ্যাংদোলা করে' তুলে নিয়ে একেবারে ইংরেজ জাহাজে! ক্ষিপ্ত সিংহের মত সারারাত পায়চারি করতে লাগল খাজা নাজিম। কিন্তু সকালে দেখা গেল নাজিমের মেজাজ বেশ ঠাণ্ডা। 'ট্রেড ইনক্রিজ' জাহাজে গিয়ে নাজিম ব্যাপারটা শেষবেশ মিটিয়ে নিলেন! এবং আরও দেখা গেল, কাতর মিনতি অপেক্ষা তদ্বিহদ্বি অনেক বেশী কার্যকর দাওয়াই। সেই মুঘল যুগেও।

কিন্তু এত করেও আসল কাজ হ'ল না। মুকাবর খাঁ একদিন জন জুর্ডেনকে ডেকে বললেন, দেখুন মানে মানে এখন তল্পি গোটান। সুরাটের কুঠী বসানর ব্যাপারটা জিগ্যেস করতেই যেন আকাশ থেকে পড়লেন! ভাবখানা এই—এমন অবাক কথা সেই মুঘল আমীর আগে যেন কদাপি শোনেননি! স্যার হেনরি মিডলটনও তখন তিতবিরক্ত। মুঘল রাজকুলের ব্যবহার আলাপ আলোচনার ধরণধারণে তিনি অতিষ্ঠ। ক্ষুব্ধচিত্তে তিনি সবাইকে সুরাটস্থ তাঁর ভাইবেরাদর ইংরেজ বাসিন্দাদের

সব জাহাজে উঠে আসতে বললেন। উঠে এলেন জন জুর্ডেনও। তাঁকেও তুলি গুটোতে হ'ল ভারতবর্ষ থেকে। তাঁর ভারত-ভ্রমণ শেষ হয়ে গেল। জাহাজ 'পেণারকর্ণ' নোঙর তুলল সুরাট থেকে। ছয়ই ফেব্রুয়ারি। ষোলশ' বার।

অবশ্য দ্বিতীয়বার ইংরেজ বহরের কর্তা হয়ে আসেন জন জুর্ডেন। তবে ভারতবর্ষে নয়। মালয় দ্বীপপুঞ্জের মালাক্কায় বিশেষ করে' যাবার হুকুম ছিল তাঁর। হুকুম ছিল মশলার রাজ্যে মালয়, বোর্ণিয় জাভা বালি ও বোর্ণিওতে ওলন্দাজরা যে বিরাট ব্যবসা ফেঁদেছে—সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে, তাতে ভাগ বসাতে। সেবার নানা প্রাণ সংশয় উপেক্ষা করে' কি ভাবে ইংরেজদের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েছিলেন জন জুর্ডেন, সে একরোমাঞ্চকর অধ্যায়। তারপর মালয় উপদ্বীপের বিখ্যাত বন্দর পাইনীর সমুদ্রউপকূলে-দুর্ধর্ষ ওলন্দাজদের সঙ্গে এক অসম লড়াইয়ের পর যখন সাদা পতাকা উড়িয়ে শান্তি আলোচনা চলছিল সেই সময় এক চোরাগুপ্তা গুলি এসে জন জুর্ডেনের প্রাণটা অকস্মাৎ নিয়ে নিলে। জুলাই, ষোলশ' উনিশ। তাঁর দুই ভাগ্নে ছিল সঙ্গে। পাইনীর বুকে তাঁরাই তাঁকে সমাহিত করে। সুদূর ইংলণ্ড থেকে অনেক অনেক দূরে!

জন জুর্ডেনের ভারত ভ্রমণকে কেউই বড় একটা আমল দেয়নি। এর উল্লেখও বড় একটা কেউ করেনি। সারাজীবন যেমন সংসারের ভালবাসা পাননি তিনি, তেমনি' মৃত্যুর পরও পৃথিবীর কাছে তার সমান অনাদর জুটেছে। হয়ত অনেকেই বলবেন, জনের বিবরণে নতুন কিছু নেই। না থাক, তবু সমসাময়িক বিবরণ মিলিয়ে নেবার জন্য coroborative evidence হিসেবে তাঁর সাহায্য অস্বীকার করা যায় কি করে? তা' ছাড়া জুর্ডেনের আরেকটা বড় কাজ 'সোয়ালি' আবিষ্কার। সেটাযে সেযাত্রায় মিডলটনকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল তাই নয়; বহুদিন ধরে ইংরেজদের কেন, ঐ উপকূলে সকল নাবিকদেরই যথেষ্ট উপকার করেছিল। তবে বিস্ময়ের কথা, মিডলটন এই ব্যাপারে জুর্ডেনকে স্বীকার করেননি। স্বীকার করেননি হকিন্স ও। অবশ্য হকিন্স নাহয় জুর্ডেনকে দেখতে পারতেন না, কিন্তু মিডলটনও জুর্ডেনের বন্ধু ছিলেন। তবে?

অবশ্য এরা কেউই না করুন, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর বড়কর্তারা জুর্ডেনকে ঝেড়ে ফেলে দেননি। ছয়ই নভেম্বর, ষোলশ' সতেরর কোম্পানীর এক বিবরণে লেখা আছে: ···'as well for his service for the sixth voyage as the harard he raune intto to give him (Middleton) !ntelligence of the portugall, with the danger of his life passing amongst the portugalls in Mogols habitt, swymming over a river, to advice him (Middleton) of the porte of swally, and for many other services set downe in particular ···' ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী শুধু লিখেই জুর্ডেনের কৃতিত্ব স্বীকার করেননি। সর্বকুলো এই সব কাজের জন্য দুইশত পাউণ্ড ইনাম দেন তাঁকে!

আগেই বলা হয়েছে, পারিবারিক শান্তি কোন দিনই পাননি জুর্ডেন। তুঁষের আগুনের মত ঐ বেদনা ধিক্ ধিক্ করে সারাজীবন তাঁকে দহন করেছে। তাঁর একমাত্র সন্তান তাঁর মৃত্যুর আগেই অকালে মারা যায়। তাঁর মৃত্যুর পর বোন সুসান ভিনে তাঁর উইলের প্রোবেট নেন এবং কোম্পানীর কাছে তাঁর যা পাওনা তা দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য দাবী করে। কিন্তু কোম্পানী টিমে তেতালায়

চলতেই থাকে এবং একসময় বোন সুসান ভিনেরও এন্তেকাল হয়ে যায়। ভাগ্নে জোনাস এসে সম্পত্তি দাবী করে। কোম্পানীর কাছে জন জুর্ডেনের নাকি আটশত পাউণ্ড গচ্ছিত ছিল—সেটা সুদে আসলে দাঁড়িয়েছে বারশ' পাউণ্ড। জোনাস তখনত বয়সের হিসেবে সাবালক হননি। কাজেই কোম্পানী তাকে হাঁকিয়ে দিলে। কিন্তু জোনাস অনেক ধুরন্ধর ছেলে। অনেক বলে কয়ে কোম্পানীকে রাজী করালে তাকে চারশ পাউণ্ড দিতে। বাকিটা সাবালক হলে সে নেবে।

কিন্তু অনেকটা যেন আকাশ ফুঁড়ে আর একটা দাবীদার হাত বাড়িয়ে দাঁড়ালে। সে আর কেউ নয়—জন জুর্ডেনের বিধবা—সুসান জর্ডন। কোম্পানীত মোকা পেয়ে গেল। বললে, আদালতে গিয়ে তোমরা আগে মীমাংসা করে এস—টাকাটা পাবে কে? যাকে বলবে আমরা তাকেই দিয়ে দেব। সুসানের তরফ থেকে কোম্পানীর কাছে একটা আবেদন এসে পৌঁছিল—তাঁকে সাহায্য করার। তাঁর জীবিকা নির্বাহ করার জন্য। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী বড় শক্ত ঠাঁই। তারা বললে, ও সব হবে না। তবে তাদের 'দরিদ্র ভাণ্ডার' থেকে দশ পাউণ্ড সাহায্যের ব্যবস্থা হল। কিছুকাল পরে দিলে আরও দশ পাউণ্ড। এদিকে সুসানের মামলা চালাবার জন্যে বললে কোম্পানীর সলিসিটরকে। যাই হোক, অনেক আদালত ঘুরে শেষে সাব্যস্ত হ'ল সুসানই পাবেন টাকাটা। কোম্পানী তাঁকে পুরো টাকাটা মিটিয়ে দিলে। এইবার সুসান জোনাসের বিরুদ্ধে কেস করলেন। অন্যায়ভাবে তাঁর প্রাপ্য টাকা সে নিয়েছে! এই মামলার ফল কি হ'ল তার কোন হদিশ পাওয়া যায় না; কিন্তু এটা বোঝা যায় সারা জীবন যেমন সুসান শান্তি দেননি জন জুর্ডেনকে, তেমনি স্বামীর মৃত্যুর পর জুর্ডেনের আত্মীয়-স্বজনকেও রেহাই দেননি তিনি! বোধ করি, নিজে জ্বলতে জ্বলতে কেবল জ্বালা ছড়িয়ে বেড়িয়েছেন সর্বত্র! এবং মরেও জুর্ডেন যেন তাঁর হাত থেকে রেহাই পেলেন না!

গ্রন্থপঞ্জী:

The Journal of John Jourdain Ed : William Foster.
The Embassy of Sir Thomes Roetoludia Ed : William Foster.
Early Travels in India : ditto.
First letter of the East India Company : Bird Wood and Foster.
Tuzuk-I-Zehangirta. Ed. Bayeridge 2 vols.

দর্শনশাস্ত্র ও ভাষা

পুণ্যশ্লোক রায়

ভাষা নিয়ে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। ভাষা কি? ভাষা কাকে বলে? অভাষা কি? ভাষা কখন হয় অভাষা? ভাষার কথা কি বুঝে বলি ও কি বোঝাতে চাই?

ভাষা সম্বন্ধে তিনটি ধারণা প্রচলিত। এই ধারণাগুলি পৃথক অথচ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। মিল বা অমিল কি কি এবং কোথায় দেখাতে চেষ্টা করব। পৃথক অথচ সম্পর্কিত এই তিনটি ধারণা কি করে এক সঙ্গে সম্ভব তা হলে বোঝা যাবে। তবে আগে এ টি আয়ার তাঁর দর্শনে ভাষা সম্বন্ধে কি বলেন দেখা যাক। তিনি একটু গোলমাল সৃষ্টি করেছেন।

দর্শনের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে এ টি আয়ার লিখেছেন—

দার্শনিক ভাবে কোনো একটা ভাষার সম্পূর্ণ রূপ ব্যাখ্যা করতে হলে প্রথমে দেখতে হবে কি ধরণের এবং কত রকম sentence বা বাক্য বেশী ব্যবহার করা হয়। দেখতে হবে নানা বাক্যের মধ্যে সম্পর্কটা কি? একটি বাক্যের symbol বা প্রতীক অন্য বাক্যে বসালে পরে যতি প্রতীকের অর্থ বদলে না যায় বুঝতে হবে দুটি বাক্য এক রকমের। ভাষার গঠন প্রকাশ পায় যখন বাক্যের অর্থ ঠিক থাকে। সুতরাং দর্শনের যে কোন বিশেষ তত্ত্বে—যেমন বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর তত্ত্বে আংশিক ভাবে ভাষার গঠন প্রকাশ পায়। দৈনিক ইংরেজী এবং যে ভাষার গঠন ইংরেজীর মতন যেমন ফরাসী ও জার্মাণ তা নিয়ে রাসেল কাজ করেছেন।

এই ধারণা থেকে এ. টি. আয়ার কিন্তু সরে যান যখন বলেন দর্শনের সব প্রস্তাব ভাষাতত্ত্বের প্রস্তাব এবং দার্শনিকের কাজ হচ্ছে প্রতীকের বর্ণনা করে তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা। একটা টেক্‌নিক্যাল কথা আছে 'to define in use'. তিনি এই রকম ভাবে কথাটা বুঝিয়ে দেন: প্রতীক বা সিম্বল কি জানবার জন্য আমরা বলি এক প্রতীক অন্য প্রতীকের সমান। ব্যবহারে তার অর্থ দেখানো হয় এক বাক্য অন্য বাক্যে তর্জমা করে। প্রথম বাক্যে প্রতীক থাকে। দ্বিতীয় বাক্যে প্রতীক থাকে না। শব্দার্থের বিশেষ বর্ণনা কেমন করে করতে হয় তার সম্বন্ধে Russell-এর একটা তত্ত্ব আছে। পদ্ধতি এই রকম: একটা বাক্য নেওয়া যাক—'The author of waverly was scotch' তর্জমা করে যখন তার জায়গায় লেখা হয়: 'One person and only one person wrote waverly and that person was scotch.' তার অর্থ আরো স্পষ্ট হয়।

এই দিক থেকে দেখতে গেলে প্রত্যেক ব্যাখ্যা বা বর্ণনা বা সংজ্ঞা এক রকম তর্জমা। আয়ার-এর কাছে তর্জমা করা মানে আদি বাক্য এমন ভাবে নতুন বাক্যে পরিবর্তিত করা যাতে তার শব্দার্থ অক্ষরে অক্ষরে ধরা পড়ে। বাক্য সত্য কি মিথ্যা জানবার জন্য এই তর্জমা। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় সত্য মিথ্যা ভাব স্পষ্ট করার জন্য। অক্ষরে অক্ষরে বাক্যার্থ দেখানো হয়।

ভাষার সম্বন্ধে যে ধারণার ওপর এই তত্ত্ব স্থাপিত সেই ধারণাটাই অস্পষ্ট। ভাষার নিম্নলিখিত লক্ষণ আছে। এই লক্ষণের সঙ্গে তুলনা করা যায় অভাষা বা যা ভাষা নয়।

প্রথম লক্ষণ—ভাষা একটা সঙ্কেত বা প্রতীকের প্রণালী অর্থাৎ লিখিত চিহ্ন বা উচ্চারিত শব্দের প্রণালী এবং এই প্রণালীর সীমার মধ্যে সেই সঙ্কেত ও প্রতীক নানাভাবে সাজানো যায়। স্থানান্তর করলে পরে অর্থ অটুট থাকে।

দ্বিতীয় লক্ষণ—ভাষা একটা সঙ্কেত বা প্রতীকের প্রণালী যার সীমার মধ্যে প্রতীক বা সঙ্কেত স্থানান্তর করে সত্য মিথ্যা ফুটিয়ে তুলতে পারা যায়। এই লক্ষণ দুটি পরস্পরের পক্ষে সঙ্গত নাও হতে পারে। আয়ার যখন ব্যবহারে অর্থ প্রকাশের কথা বলেন তাতে বেশ খানিকটা ব্যর্থযুক্ত ভাব থাকে। 'All men are mortal'-এর জায়গায় যখন লেখা হয় 'No man is not mortal' তখন বাক্যের ছাঁচ রূপান্তরিত হয় মাত্র। সত্য মিথ্যা নির্ণয় করার প্রশ্ন ওঠে না এখানে। সঙ্কেত বা প্রতীকের সাজানোর মধ্যেও কোন বিশেষ তফাৎ বা লাভ ঘটে না। রাসেল-এর তত্ত্ব আলোচনা করার সময় যে নমুনা দেওয়া হয়েছে তার মতনও হতে পারে।

তাঁর বইএর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় আয়ার তিন রকম প্রভেদ দেখান। তাঁর মতে একটা সেন্‌টেন্‌স্ হচ্ছে 'any form of word that in grammatically significant.' অর্থাৎ ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে শব্দ সিরিজের যে কোনরূপ মানে যার আছে। ষ্টেটমেণ্ট হচ্ছে 'any two sentences are mutually translatable.' অর্থাৎ পরস্পরের রূপে যে কোনো দুটি বচন তর্জমা করা যায়। এবং প্রপোজিসন্ বা প্রস্তাব হচ্ছে সেন্‌টেন্‌স্ যা হয়ে ওঠে যখন অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়। অতএব আয়ার-এর মতে ভাষা এমন একটা লিখিত শব্দ প্রণালী যার সীমার মধ্যে অর্থ অটুট রেখে একটি বচন অন্য বচনে পরিণত করতে পারা যায় বা এমন একটি প্রণালী যার সীমার মধ্যে বচন রূপান্তরিত করা যায় প্রস্তাবে।

ব্যর্থযুক্ত ভাব আবার আসে যখন আয়ার বলেন—'the material object language' বা বস্তুর ভাষা বা 'sense datum language' বা ইন্দ্রিয়ভিত্তিক ভাষা যেমন ইংরেজী বা ফরাসী ভাষা বলা হয়। আয়ার-এর মতে শব্দার্থের বিশেষ বর্ণনা তত্ত্ব প্রয়োগ করলে দৈনিক ইংরেজীর গঠন আংশিক ভাবে প্রকাশ পাবে। দৈনিক ফরাসী ও জার্মাণের বেলাও তাই। যে ভাষার গঠন ইংরেজীর মতন তার বেলায় এই কথা খাটে। টীকায় আয়ার তাঁর মত সংশোধন করতে চেষ্টা করেন: 'দার্শনিক যে ভাষা নিয়ে কাজ করেন সেই ভাষা কৃত্রিম বা অপ্রাকৃতিক। অকারণে এই কথা বলা হয় না। আমরা যে রীতি পালন করে শব্দ ব্যবহার করি সেই রীতি প্রণালী শুদ্ধ সবসময় হয় না।' আয়ারের এই কৃত্রিম ভাষার সঙ্গে Esperantoর তুলনা করে দেখা যায় যে ব্যর্থযুক্তভাব দূর হয় না। আয়ার যখন বলেন ইংরেজী ফরাসী ও জার্মান ভাষার গঠন এক তখনও ব্যর্থযুক্তভাব প্রকট হয়ে ওঠে। বক্তৃতা ইংরেজীতে শুরু করে কি কেউ কথার মাঝখানে ইংরেজী থেকে বিচ্যুত হয়ে ইন্দ্রিয় ভিত্তিক ভাষা অবলম্বন করতে পারে?

ভাষা বলতে ভাষাবিজ্ঞানী যা বোঝেন আয়ার তা বোঝেন না। যে ইংরেজীতে দৈনন্দিন কথাবার্তা চলে বা খবরের কাগজে লেখা হয় বা কবিতা লেখা হয় সেই ভাষা আয়ার এর ভাষা নয়। যে ইংরেজী স্কুলে পড়ানো বা রেডিওতে বলা হয় সেই ইংরেজী আয়ার-এর ভাষা নয়। দার্শনিক উল্লেখের বাইরে এই ধরণের ভাষার কোনো অস্তিত্ব নেই। 'God' এই ধরণের একটা শব্দ। একটা

অলৌকিক কল্পিত ভাষা। এইখানে আয়ার শ্রেণী বা বিভাগ ভুল করেছেন বা কথা নিয়ে খেলা করেছেন। ভাষা বলতে জনসাধারণ যা বোঝে তিনি তা বোঝেন না। এই কারণে তাঁকে বলা চলে ভাববাদী দার্শনিক।

ভুলটা কোথায়? ভাষা সম্বন্ধে যে তিনটি ধারণা প্রচলিত তিনি তা এক মনে করেছেন। এখানে তাঁর ভুল। ভাষা হচ্ছে :

(১) এমন একটা প্রতীক বা শব্দের প্রণালী যাতে নিয়ম অনুসারে সমার্থ শব্দ বা প্রতিশব্দ স্থির করা হয়ে থাকে। পদ সাজানো রীতি ও স্থির হয়ে থাকে।

(২) এমন একটা প্রণালী যার প্রতীকের অর্থ এতো সুনিশ্চিত যে অনিশ্চিতার্থ বা দ্ব্যর্থযুক্ত ভাবাপন্ন প্রতীক তাতে বসানো যেতে পারে।

(৩) পাশাপাশি যাঁরা থাকেন তাঁরা পরস্পরের সংবাদ দেওয়া-নেওয়ার বেলা যে শব্দ বা প্রতীকের প্রণালী এবং পদবিন্যাসপদ্ধতি ব্যবহার করেন।

ভাষা সম্বন্ধে প্রথম ধারণাটা বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন আর, কারনাপ। অতি স্পষ্টভাবে তিনি তার রূপ দেখিয়েছেন। তিনি বলেন বাক্যের যুক্তিসঙ্গত রূপ ও বাক্যের সঙ্গে বাক্যের যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক নির্ভর করে বাক্যের পদ বিন্যাসের প্রকরণের ওপর। সাধারণ একটা ধারণা আছে যে পদ বিন্যাসের প্রকরণ এবং যুক্তিসঙ্গত অর্থ বিচারের নিয়ম এক নয়, আলাদা। তিনি এই ধারণা বাতিল করতে চান। যুক্তিসঙ্গত অর্থবিচার বা লজিক, পদ-বিন্যাস বা সিনট্যাক্স-এর অঙ্গ হয়ে যাবে যদি সিনট্যাক্স-এর বিস্তার যথেষ্ট প্রসারিত ও নির্ভুল হয়। তিনি বিনয়ের সঙ্গে বলেন ভাষার একদিক প্রকৃতি-নির্দেশ করে গণিত বা ক্যালকুলাসের মতন। সিনট্যাক্স বা পদ বিন্যাস সেই দিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তবে তিনি মনে করেন ভাষা গণিত বা ক্যালকুলাস ছাড়া কিছু নয়। ভাষার আকৃতি প্রকৃতি ক্যালকুলাস-এর মতন হতে পারে কিন্তু তার অন্য একাধিক রূপও আছে। এইরূপ কি কি জানতে হলে অন্য উপায় অবলম্বন করতে হবে। একটা উপায় সেমাসিওলজিক্যাল। তার মানে শব্দের অর্থ দেখা। আর একটা উপায় সাইকোলজিক্যাল। তার মানে শব্দ বা প্রতীকের সঙ্গে ব্যবহার ও উপলব্ধির সম্পর্ক দেখা। তৃতীয় উপায় সোসিওলজিক্যাল অর্থাৎ একটা সমাজের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে লোকে কি ভাবে সংবাদ দেওয়া-নেওয়া করে আসছে তার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ। এই রকমভাবে কারনাপ গণিতের বিচার অনুযায়ী ভাষা নিয়ে কাজ করেন। সিনট্যাক্স বা পদ-যোজনা এবং অর্থের বিচার বা যুক্তি এবং ক্যালকুলাস বা গণিত একটা নির্দিষ্ট রূপে গণ্য করেন।

গণিত বা ক্যালকুলাস বলতে কারনাপ কি বোঝেন? তিনি লিখেছেন :

'ক্যালকুলাস নিম্নলিখিত রীতি বা নিয়মের পদ্ধতি। এই নিয়মের উপকরণ তাদের প্রকৃতি এবং সম্পর্ক অনুসারে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। উপকরণগুলি প্রতীক বা পদ কেবল এইটুকু ধরে নেওয়া হয়। এদের কোনো একটা সীমাবদ্ধ শ্রেণীকে বলা হয় গণিত বা ক্যালকুলাস।'

ক্যালকুলাস-এর নিয়ম অনুসারে একটা বিশেষ প্রতীক বা পদ কোন অবস্থাতে কোন শ্রেণীতে

অন্তর্ভুক্ত হবে স্থির করা হয়। এবং কোন প্রতীক বা পদ কি অবস্থাতে রূপান্তরিত করা যায় তাও ক্যালকুলাস-এর নিয়ম অনুসারে স্থির করা হয়।'

ভাষা তাহলে ক্যালকুলাস হয় কেবলমাত্র তার গঠনে। ভাষা একমাত্র ক্যালকুলাস নয়। কারনাপ মনে করেন প্রত্যেকটি শৃঙ্খলিত প্রণালী এক একটা ক্যালকুলাস এবং তিনি পদ যোজনা বা সিনটেক্স অ্যামিতি ও সম্মিলিত বিশ্লেষণের সঙ্গেও তুলনা করেন।

জার্মানের মত কোনো বিশেষ ভাষার পদ যোজনার গঠন কারনাপের কাছে হবে এই রকম : 'এমন একটা ক্যালকুলাস যা ঐতিহাসিক কথাবার্তার অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গতভাবে খাপ খায়। এই ক্যালকুলাস রচনা পদ যোজনার প্রণালীর সীমার মধ্যে। তত্ত্ব অনুসারে এই ক্যালকুলাস হয়েছে কি না বিচার করা হবে ঐতিহাসিক বা ইন্দ্রিয়ভিত্তিক জ্ঞানের দিক থেকে। এই দুটি পদ যোজনার প্রণালীর বাইরে।'

জার্মান ভাষার যুক্তিসঙ্গত রূপ বা পদ যোজনার গঠন তাহলে হবে সেই ক্যালকুলাস অনুসারে যে ক্যালকুলাস যথোচিতভাবে তার সঙ্গে খাপ খায়। মূল উপকরণগুলি এবং তাদের বিন্যাসের বা রূপান্তরের নিয়ম অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া হয় না। বরং এই নিয়মও পদ-বিন্যাসের প্রণালী অভিজ্ঞতার ওপরে কমবেশী সুবিধা দেখে ন্যস্ত করা হয়।

সুতরাং কারনাপ যখন ভাষার কথা বলেন তিনি নানা রকম গণিতের কথা বলতে থাকেন। তিনি বলতে পারেন 'বিজ্ঞানের ভাষা' বা 'দাবা খেলার ভাষা' বা 'ইংরেজী ভাষা'। সব কটা তাঁর কাছে এক একটা ক্যালকুলাস। তাঁর কাছে ভাষা ইন্দ্রিয়ভিত্তিক মোটেই নয়। ইন্দ্রিয় ভিত্তিক ভাষাকে ভাষা বলা চলে যদি রূপ বিন্যাসের প্রণালীর সঙ্গে তার মিল থাকে। কত মিল আছে কারনাপ খোঁজ করেন চিন্তায় বা বাস্তব অবস্থায় নয় ভাষার আদর্শ ছাঁচের মধ্যে। তাঁর চর্চার বিষয় সম্মিলিত বিশ্লেষণ—নানা প্রণালীর গঠনে। তিনি দেখেন না কতদূর নিয়মের মধ্যে আনা যায় সাংস্কৃতিক বা গণিতের পদ্ধতি। তিনি জানেন যে কোন একটা প্রণালীতে সব সম্ভাবনা প্রকাশ করা যায় না। বহু নিয়মাবলী বা সিরিজ-এর প্রয়োজন।

ভাষা সম্বন্ধে প্রথম ধারণাটা দ্বিতীয় ধারণার সঙ্গে যুক্ত নয়। আপাত দৃষ্টিতে যদিও তাই মনে হতে পারে। মনে হয় একটা গঠন প্রণালী বেছে নিয়ে তার মধ্যে অন্যসব প্রকরণ বদালে সেইগুলি অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে। মনে হতে পারে যে যদি পৌরাণিক ও কাল্পনিক বিষয় প্রকরণ হিসাবে বিজ্ঞানের ভাষায় এনে ফেলা হয় তাদের গুরুত্ব আমরা বুঝতে পারব। গামো প্রশংসনীয়ভাবে বিজ্ঞানের ভাষা দৈনন্দিন ভাষায় তর্জমা করেছেন। আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে ইউ, এস, এ এবং ইউ, এস, এস, আর-এর মধ্যে বোঝা পড়া হবে যখন এমন ভাষা আবিষ্কার হবে যা ডুপফের কাছে বোধগম্য। তবে এই একটা কল্পনা মাত্র।

বিশেষ লক্ষণীয় একটা ব্যাপার আমরা উপেক্ষা করছি এই সব কল্পনা করতে গিয়ে। ভাষার সম্বন্ধে যে প্রথম ধারণার কথা বলা হয়েছে তাতে ভাষার প্রকরণে অর্থের স্থান নেই। এই ধারণা

অনুসারে ভাষা হচ্ছে লিখিত চিহ্নাবলী বা শোনা শব্দের একটা প্রণালী। এই চিহ্নাবলীর অর্থ বা শব্দের অর্থ তার মধ্যে ধরা হয় না। গঠন প্রণালীর সঙ্গে তার প্রয়োগ বা ব্যাখ্যার কোনো সম্পর্ক থাকে না। পদ-রূপান্তর ঘটতে পারে অথ অটুট রেখে তবে অর্থের স্থানান্তর বা রূপান্তরের প্রশ্নও ওঠে না। অর্থের তর্জমা ভাষা চর্চার মধ্যে পড়ে না। কাজেই ভাষা বিজ্ঞানের কার্যক্ষেত্রের বাইরে অর্থহীন বিষয়ের রূপান্তর করে তাকে অর্থপূর্ণ করা বা যার সত্য প্রমাণ নেই তার রূপান্তর করে সত্য প্রমাণিত করা বা যাকে ব্যাখ্যা করা যায় না তার ব্যাখ্যা করার প্রশ্নও ওঠে না।

ভাষা সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রচলিত ধারণায় গঠন গৌণ এবং জোর দেওয়া হয় অর্থের ওপর। ভাষা হয় মূল অর্থের চিহ্নাবলী বা প্রতীক অর্থপূর্ণভাবে সাজানোর নিয়মাবলী। এই দৃষ্টান্ত যদি খুঁজি দৈনন্দিন ইংরেজীতে একটা অচল বাক্য পাব যেমন 'monday is square' যদি বলি এটা যুক্তিসঙ্গত নয় তা হলে কারনাপ যাকে যুক্তি বলেন তার সঙ্গে আমাদের যুক্তি মেলে না। ভাষাকে প্রথম প্রচলিত ধারণা থেকে দ্বিতীয় ধারণার সরিয়ে আনা হয় যখন তখন যে কথাগুলি বা টার্মস্ ব্যবহার করে আসছি ভাষা বর্ণনার বেলা তাদের অর্থেও একটা পরিবর্তন ঘটে। যেমন সিনট্যাক্স বা পদ যোজনা, স্ট্রাক্চার বা গঠন, লজিক বা যুক্তি, এ্যানালিসিস্ বা বিশ্লেষণ, ট্রান্সলেশন্ বা তর্জমা, ডিষ্ট্রীবিউসন বা বিস্তার। গঠন হবেনা চোখে দেখা চিহ্ন ও কানে শোনা শব্দের একটা ছাঁচে ফেলা প্রণালী। বরং গঠন হবে সেই চিহ্নও শব্দের বোধগম্য উল্লেখ যোগ্য সম্বন্ধের আদর্শ প্রণালী। ভাষার এই দুটি প্রচলিত ধারণা স্বতন্ত্র করার জন্য বর্ণনার বিশ্লেষণ ভাসিয়ে না দিয়ে তাদের সাহায্যে কতকগুলি নতুন টার্মস্ ঠিক করতে হবে। প্রথম প্রচলিত ধারণার জন্য 'গঠন' কথাটা রাখা যাক। দ্বিতীয় ধারণার জন্য কথাটি হোক 'অর্থ' বা মিনিং। যে দুটি কথা ঠিক করলেন সি মরিস্ 'syntactics ও 'semantics'—ব্যবহারও করা যেতে পারে। তাদের সঙ্গে L- Hjelmslev-র দুটি কথা—'expression' ও content' চলে। কিন্তু কোনো দুটির কথা নির্ভুল হবে না যতক্ষণ আমরা উপলব্ধি না করি ভাষায় এই দুটি ধারণার মধ্যে ব্যবধান কতখানি।

Meaning বা অর্থ হবে কেবল মাত্র একটা স্থান। সেই স্থানে বসানো হবে সম্বন্ধে শ্রেণীতে সন্নিবদ্ধ সম্মিলিত সম্পর্ক প্রণালী পদ ও রূপ বিন্যাসের নিয়মের মতন নিয়মে গঠন করা হবে। বাস্তব ক্ষণস্থায়ী পরিবেশে যেখানে বক্তা, বস্তু ও শ্রোতা উপস্থিত সেস্থলের সম্পর্ক নির্দেশ বা বস্তু নির্দেশের অর্থ এই সম্পর্ক প্রণালী থেকে বিভিন্ন। সম্পর্ক প্রণালী হবে এমন একটা আদর্শ ছাঁচ যা একাধিকবার প্রয়োগ করতে পারা যায়। এই রকম প্রভেদ যার চোখে দেখা কানে শোনা উপলব্ধি ও ফর্ম বা রূপের মধ্যে অভিন্নতা বা আকৃতি মিনিং বা অর্থ প্রকাশ পাবে না। প্রকাশ পাবে সম্বন্ধ ও সম্পর্কের ভিতর দিয়ে। অর্থের কাঠামোর সীমার মধ্যে মূল অর্থের প্রকরণকে বিশ্লেষণ করতে পারা যায় যেমন রূপের বিশ্লেষণ করা হয় পদবিন্যাস করে রূপের কাঠামোর মধ্যে। দুটির মিল এতে বেশী যে নজরে পড়ে না তাদের পার্থক্যের পরিমাণ। মিল থাকার দরুণ রূপ বিন্যাস ও বিস্তারের সঙ্গে অর্থের ব্যাখ্যা মিশে যাওয়া যথাযথ মনে হতে পারে। এই হয় যখন বলি শব্দার্থ তার ব্যবহারের নিয়মে প্রকাশিত এবং মনে হতে পারে রূপের ব্যাখ্যা অর্থের কাঠামোতে মিশে যাওয়া যথাযথ। এটা হয় Pesto র তত্ত্বে। দুটোকেই এড়িয়ে যাওয়া ভালো।

রূপের প্রণালী অর্থের প্রণালী তাদের উল্লিখিত সম্বন্ধের বিস্তারে স্বতন্ত্র। তবে সাধারণভাবে দুটির মধ্যে একটি সম্পর্ক আছে বলে ধরে নেওয়া হয়। রূপের প্রণালী এমন হবে যাতে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে। রূপের প্রণালীর প্রকরণ এক পোঁচ কালী বা একটা শব্দের চেউ নয়। It is a type not a token অর্থাৎ নিদর্শনের প্রকার নয়, আদর্শ নমুনা। এটা বহুবার দেখা দিতে পারে কাল ও স্থানের অসীম বিস্তারের মধ্যে বিশেষ কালে শোনা বা চোখে দেখা উপলব্ধিতে বা শারীরিক সাড়াতে। এই আদর্শ নমুনা দেখে সম্পর্ক ব্যাখ্যা বা নির্দেশ করা হয় বস্তু দেখে নয়। তার অস্তিত্ব তুলনায়, গুণ বৈষম্যে। তার অভিন্ন স্বরূপ নেই। 'x' চিহ্ন যা তা হয় 'y' ও 'z' এর তুলনায়। 'y' ও 'z' এর এর সঙ্গে তার সম্পর্ক তার অর্থে। 'x' যে কি তার জানার দরকার নেই। এইটুকু জানলে হয় যে 'x' থাকাতে এক বাক্যের অর্থ অন্য বাক্যের অর্থ থেকে পৃথক হয়। অথবা 'x' এর জায়গায় 'y' বসাতে পারা যায় অর্থ অটুট রেখে বা 'y' এর জায়গায় 'x' বসানো যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে। সুতরাং রূপের প্রণালীতে অর্থের দরকার আছে তবে আংশিক ভাবে। দেখতে হবে শুধু বিশেষ অর্থের কোনো পরিবর্তন ঘটেছে কিনা। যদি ঘটে থাকে রূপবিন্যাসের দ্বারা সেটা দেখাতে হবে।

অর্থের প্রণালী গঠনে রূপ বিন্যাস বাদ দিলে চলে না। শব্দার্থের চর্চা শূন্যে হয় না। রূপের পরিবর্তনে অর্থের পরিবর্তন দেখা যায়। অবশ্য রূপ প্রণালী কি ভাবে গঠন করা হয় এবং তাতে কিভাবে অর্থ প্রকাশ পায় তা শব্দার্থের চর্চার মধ্যে পড়ে না। 'and', 'or', বা 'and/or' এর অর্থ প্রকাশ করতে ভাষায় তিনটি রূপ থাকতে পারে। তবে এই তিনটির কি স্থান গঠন প্রণালীতে এবং তাদের রূপ বিন্যাস বা রূপান্তর কিভাবে হয় তা শব্দার্থের চর্চার মধ্যে পড়ে না। রূপের রকমসকম জানার দরকার নেই। শুধু জানলে হয় সম্ভবত অর্থের পরিবর্তন চিহ্নিত করা হয় রূপের পরিবর্তনে।

গঠন প্রণালীও অর্থের প্রণালীর মধ্যে যে পার্থক্য তা কেমন করে অতিক্রম করা যায় বোঝা যাবে যদি বাক্য বা sentence এবং proposition বা প্রস্তাবের মধ্যে প্রভেদটা দেখি। বাক্য বর্ণনা করা যায় এই রকমভাবে—বাক্য এমন এক সারিবদ্ধ প্রকরণ যার পদ পৃথক এবং যা বারবার ব্যবহার করা যায়। অথচ এই সারিবদ্ধ প্রকরণ অন্য এক ধরণের বাক্য কি বাক্যের অঙ্গ নয়। এবং প্রত্যেকটি সারিবদ্ধ প্রকরণ একটা সীমাবদ্ধ শ্রেণীর অন্তর্গত। বাক্য বর্ণনা যদি রূপের দিক থেকে করা হয় বাক্যার্থের কথা ওঠে না। রূপবিন্যাসের নিয়ম অনুসারে বাক্যের গঠন হলেই হল। রূপ বিন্যাসের বা গঠনের দিক থেকে এই তিনটি বাক্যের দোষ নেই : (১) Monday is square (২) The author of Waverly was Scotch (৩) God is in his heaven। তিনটি অনুমোদিত নিয়মে বা ছাঁচে তৈরী। (১) noun-verb-adjective বা বিশেষ্য-ক্রিয়া-বিশেষণ (২) determiner-noun-preposition noun-verb adjective বা সম্বন্ধ সূচক অব্যয় পদ-বিশেষ্য অব্যয়পদ-বিশেষ্য-ক্রিয়া-বিশেষণ (৩) noun-verb-preposition-noun বা বিশেষ্য-ক্রিয়া-অব্যয়পদ-বিশেষ্য। এই বাক্য তিনটির মানে আছে কি নেই আমরা তাদের গঠন থেকে জানতে পারব না। অর্থের প্রণালী থেকে জানা যাবে। সেই অর্থ প্রণালীর প্রকরণ ও বিন্যাসের ভিতর দিয়ে অর্থ প্রকাশ পায়।

দ্বিতীয় ধারণা অনুসারে ভাষার কাজ হচ্ছে যে প্রস্তাবের নিজস্ব মানে নেই তাকে দিয়ে এমন

বাক্য গঠন করা যার মানে আছে এবং যার সত্য মিথ্যা বিচার করা যায়। The author of Waverly was Scotch। দ্বিতীয় ধারণা অনুসারে এই বাক্য হবে শুধু একটা statement অর্থাৎ বিবৃতি। পাকাপাকিভাবে প্রস্তাব বলে গৃহীত হতে পারে না কেন না তার সত্য-মিথ্যা অনিশ্চিত। গৃহীত হবার দাবী স্বীকার করা হবে যখন Russell বা Ayer-এর কথামত বাক্যকে তর্জমা করা হবে। তর্জমা করার ফলে বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট হয় এবং তার সত্যতা বিচার করা সম্ভব হয়ে ওঠে। Moore যখন বললেন 'male sibling' বলাতে 'brother'-এর জায়গায় তিনি এই ধরণের তর্জমা করতে বললেন। এক সারিবদ্ধ প্রকরণ বলানো হল অন্য এক প্রকরণের স্থানে। তর্জমার বিশদীকরণের পর প্রথম প্রকরণের বা বাক্যের মানে প্রকাশ পায়। ভাষা তাহলে একটি ভিত্তি বা আধার। ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে অন্য ভাষার দাবী বুঝে নিতে হয়।

বিজ্ঞান ও ভাববাদী দর্শন দুটি থাকে ভাষার মধ্যে। দর্শনের পুরানো অর্থে ভাষা তো দর্শনই। সমগ্র বিশ্ব নিয়ে তার কাজ। ধারণার প্রণালী, সংস্কৃতি, সভ্যতা, অর্থের তত্ত্ব—সবই তার আয়ত্তের মধ্যে পড়ে। সমস্ত সৃষ্টি নিয়ে তার গবেষণা। কোন গাছ কি রঙে সাড়া দেয় যখন প্রাণতত্ত্ব বিজ্ঞানী পরীক্ষা করে দেখেন তখন বিজ্ঞান হিসাবে ভাষাকে দেখি। রঙের শ্রেণী নির্দিষ্ট করেন তিনি দুটি শব্দ দিয়ে 'xanthic' এবং 'cyanic', এতে তাঁর কাজের সুবিধা। সাধারণভাবে যে নামে রঙগুলি পরিচিত সেই নাম ব্যবহার করেন না। এখানে লক্ষ্য করা দরকার আশ্চর্য একটা ব্যাপার। পশ্চিম আফ্রিকায় Bassa বলে একটা ভাষায় রঙ এইরকম দুটি শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত 'zinza' ও 'hui'-এর হুবহু মিল 'xanthic' cynnic' এর সঙ্গে। দোকানে কেনাকাটা করার সময় 'cyanic'-এর জায়গায় 'hui' বসালে চলে। আর একটা ব্যাপার উল্লেখ করা যায় এখানে। মিসরবাসী উটচালক ১০০টি নাম দিয়ে উটকে চেনে। ভাষা বিজ্ঞানীরা ৮০০টি পরিভাষা ব্যবহার করেন বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে। এই ৮০০টি পরিভাষা যোগ করা হয় জনসাধারণের কথার সঙ্গে।

ভাববাদী দর্শনের দিক থেকে ব্যাখ্যা করেন আয়ার তাঁর নতুনতম বইতে। তিনি লেখেন :

'কি ভাবে আমরা ব্যবহার করি বা ব্যবহার করতে ভালোবাসি এই ক্রিয়াপদ 'to know' এক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হয়। আমাদের যুক্তি ভাষাভিত্তিক। তাই বলে শব্দার্থ নিয়ে কোনো বিবাদ নেই। ইংরাজী ভাষার সঙ্গেও আমরা বাঁধা নয়। এই ক্রিয়াপদকে দিয়ে আমাদের জানবার বিষয় হচ্ছে কি কি কাজ হয়। ক্রিয়াপদটি 'to know' নাও হতে পারত। কাজ নিয়ে কথা শব্দ নিয়ে নয়। কোন্ সামাজিক অবস্থায় কি ভাবে কোন্ কথা ব্যবহার হয় সাধারণ কথাবার্তায় তা আমাদের তদন্তের বিষয় নয়। কিছু এসে যায় না যদি সাধারণ ব্যবহারে শব্দ প্রয়োগ আলাদা হয়। তবে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা চাই নিজেদের ব্যবহার সম্বন্ধে। শব্দ ব্যবহারের কথা যখন বলি তখন যে কোন ভাষায় যে কোন শব্দ ব্যবহারের কথা বলি যদি সেই শব্দ দিয়ে একই কাজ হয়। কাজ কি শব্দ কি বস্তু কি—কোনটা নিয়ে গবেষণা হচ্ছে সেইটা গৌণ। দার্শনিক জানতে চান শব্দ যার প্রতীক তার বাস্তব বর্ণনা।

ভাববাদী দর্শনে বাস্তবের স্বরূপ চর্চা করা হয়ে থাকে।

ভাষাকে এক দিক থেকে দেখলে মনে হয় যখন কেউ কিছু বোঝেন এবং যা বোঝেন তাই বলেন তখনই ভাষা তৈরী হয়। তৈরী হয় পুরানো বা নতুন নিয়মে। প্রত্যেক বিজ্ঞানী বা ভাববাদী

দার্শনিক নতুনত্ব আনেন ভাষায়। কেউ কম কেউ বেশী। বিধিবদ্ধ ভাষার বিশ্লেষণে বিজ্ঞান ও দর্শন প্রকাশ পায়! সাধারণ ভাষার বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে নালিশ করতে পারি এবং একটা নিখুঁত আদর্শ ভাষা তৈরী করতে চেষ্টা করতে পারি। বিপরীতভাবে আদর্শ ভাষার সংকীর্ণতা ও কৃত্রিমতার নিন্দা করে আমরা সাধারণ ভাষার সাধারণ জ্ঞান ও বিস্তার এবং প্রসারের প্রশংসা করতে পারি এবং পুনরায় তার আয়ত্তের মধ্যে ফিরে যেতে চেষ্টা করতে পারি। অবিচলিতভাবে বলা চলে তা হলে 'The language of fox hunting' বা 'The sense-detum language' as well as 'The English language,' ইংরেজী ভাষা হবে একটা সঙ্গতির বিশেষ কাঠামোর মধ্যে বোধগম্যতার একটা নির্দিষ্ট উপলব্ধির পরিসর।

স্থান-কালের সঙ্গে বোধগম্যতার এমন সঙ্গত কাঠামোর কোন যোগাযোগ নেই। সমাজের সঙ্গেও নেই। রঙের বর্ণনা করতে দুটি শব্দ প্রয়োগ করা হয় পশ্চিম আফ্রিকার অসভ্য জাতির ভাষায় এবং অতি উচুদরের ইউরোপীয়ান ভাষাতেও। বিজ্ঞানের ভাষা সব উচুদরের ভাষাতেই এক। এমন কি যে পরিবেশে একটার সঙ্গে অন্যটার কোন সম্পর্ক নেই সেখানেও। কোন একটা শব্দার্থ প্রণালী কোন একটা বিশেষ বাস্তব অবস্থার সঙ্গে বাঁধা নয়। রূপের প্রণালীও বাঁধা নয়। সম্ভবপর আদর্শ প্রণালী বানানো হয় দুটোতে। এর প্রয়োগ বা নির্বাচনে কোনটা লাগে না।

তৃতীয় ধারণায় ভাষাকে দেখা হয় বিপরীত দিক থেকে। এই মতে ভাষা একটা সীমাবদ্ধ সাংস্কৃতিক সম্ভবনারাশি। ইংরেজী ফরাসীর সঙ্গে এই ভাবে তুলনা করা হয় এবং দক্ষিণ অঞ্চলের ইংরেজী লণ্ডনের cockney-র সঙ্গে। একটা উপভাষার সঙ্গে অন্য উপভাষার তুলনা হতে পারে। উপভাষা ও ভাষার মধ্যে তফাৎ রাজনৈতিক। উপভাষা যখন স্বীকৃতি পায় এবং রাজনৈতিক কারণে বড় করে তুলে দেখানো হয় তখন উপভাষা হয় ভাষা। কাজের বেলায় উপভাষা ও ভাষা আলাদা রাখার প্রয়োজন আছে। তবে ভাষাবিজ্ঞানে উপভাষাকে আলাদা করে দেখার দরকার নেই কেন না তার সীমাবদ্ধপরিসরে একটা উপভাষা কোন ভাষার চেয়ে কম নয়।

ভাষার ইন্দ্রিয়ভিত্তিক বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে বিশেষ ভাষার প্রকৃতিস্থ স্থিরীকৃত বিধি পরিদর্শন করে দেখা। বলা চলে না আর 'sense-detum language' বা 'ordinary language' অভিজ্ঞতা থেকে এইগুলি আসে না। যে ধরণের ইংরেজী বা অন্য কোন ভাষার নকল করা হয় বেশী তারই বর্ণনা করা আমাদের কাজ। ভাষা সম্বন্ধে এই ধারণা ব্যাকরণ বিজ্ঞানীরা বা ভাষা বিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরে পোষণ করে আসছেন। তবে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা একাধিক ভাষার গঠন ও বিন্যাস-প্রণালী নিয়ে চর্চা করে থাকেন। এই ভাষাগুলির গঠনের মধ্যে মিল থাকতে পারে অমিলও থাকতে পারে। স্বতন্ত্র বা স্বাধীনভাবে এই ভাষাগুলি পাশাপাশি বা পরপর সাজানো থাকতে পারে। পরস্পরের ওপরে নির্ভর করতে পারে বা জড়িত থাকতে পারে। নকলযোগ্য যে ভাষা পাণিনি জানতেন তারই বর্ণনা তিনি করেছেন। অন্য কোন ভাষার গঠন বা বিন্যাস প্রণালী সম্বন্ধে তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানী বহু ভাষার গঠন, পদ-বিন্যাস প্রণালীও ব্যবহার সমাদরের সঙ্গে দেখেন।

একটি ভাষা—প্রথমও দ্বিতীয় ধারণার অনুসারে—অনেকগুলি ভাষার সমবেশ মাত্র। এই ভাষাগুলি বদলাতে থাকে। সবকটি ভাষা বিশেষ সমাজে স্বীকৃতি পায়। প্রকৃতিস্থ স্থিরীকৃত ভাষার বিধি বা normative system বলা হয় কাকে? অসমান শক্তি নিয়ে ব্যক্তির কথাবার্তা ও চাল-চলন যে শাসন করে এমন একাধিক নির্দিষ্ট পদবিন্যাস বা শব্দ প্রণালীর অনির্দিষ্ট পুঞ্জ বা সমূহ। এই পুঞ্জ সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণে সীমাবদ্ধ এবং তার মধ্যে বিভিন্ন রকম ভাষা গঠন প্রণালী থাকে। এই প্রণালীগুলির মধ্যে যোগাযোগ থাকে না এবং আলাদা ভাবে বার বার ব্যবহার করাও চলে। ভাষার স্বরবর্ণ একটা প্রণালী এবং তার শব্দ সুর বা intonation আর একটা। যোগাযোগ না-ও থাকতে পারে এই প্রণালীর মধ্যে এবং নানা ভাবে সাজান চলে। দুটি ভাষার স্বরবর্ণ এক এবং শব্দ-সুর আলাদা হতে পারে। অর্থ বিন্যাসের প্রণালীর মধ্যে অনেক বেশী অমিল থাকে। ইংরেজী অক্সফোর্ড অভিধানে দশটি বিভিন্ন অর্থ দেওয়া হয়েছে ভাষা ব্যাখ্যা করে। প্রত্যেকটির সঙ্গে একটি অর্থের জাল আলাদা রয়েছে বৈষম্য প্রদর্শন করে।

অন্যান্য ভাষার তুলনায় কোনো বিশেষ ভাষার বর্ণনা করতে হলে তার অন্তর্গত প্রণালীকে বিশেষ সমাজ ও বিশেষ যুগে বসাতে হয়। এই প্রচেষ্টা কখনও পুরোপুরি ভাবে সফল হয় না যুগে যুগে ভাষার প্রণালী রূপান্তরিত হতে থাকে। তখন দেখি বাঙ্গলায় রঙের শব্দ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত আমরা বুঝতে পারি এটা কেমন করে হয়। বাঙ্গালার সকার ধ্বনি সম্বিলিত অথচ বিপরীত প্রণালীর সঙ্গে দুটি বিপরীত অসমান প্রণালীর মীমাংসা। প্রথম প্রণালী সামাজিক সমর্থন বেশী এখনও পায়। গঠনের দিক থেকে ভাষা বিশ্লেষণ করে একটি মাত্র calculus পাওয়া যায় না। বরং ছোটো ছোটো calculi-র সারি দেখা যায়। এইগুলির মধ্যে এক একটা পালা করে ফিরে ফিরে আসে বা একটির ওপরে আর একটি বিস্তৃত হয়। শব্দার্থ প্রণালী বিশ্লেষণ করে যা পাওয়া যায় তা Roget's Thesaurue ও Duden's Pictorial Word-finderদুটির মাঝামাঝি একটা কিছু। ভাষার একতা আসে না কোনো একটা গঠন প্রণালী বা শব্দার্থ প্রণালী থেকে। এই দুটি প্রণালীর সমাবেশ মেঘের মতন। তার সীমা বা কোথায়? তার অবিচ্ছিন্নতা কিসের? একতা কোনখানে? ভালো করে বোঝা যায় না। মোটামুটিভাবে আমরা দেখি। সমস্যার সমাধান হয় না।

তৃতীয় ধারণা অনুসারে চর্চা করতে হলে ভাষাবিজ্ঞানী প্রথম ও দ্বিতীয় ধারণা বাদ দিতে পারে না। প্রথম ধারণা অনুসারে ব্যাকরণ ও phonology চর্চা বিষয়ের মধ্যে পড়ে। প্রাকৃতিকবিজ্ঞান ও যুক্তিবিজ্ঞান থাকে সঙ্গে। দ্বিতীয় ধারণা অনুসারে অলঙ্কার শাস্ত্র বা rhetoric এবং শব্দকোষ সঙ্কলন বা lexicography চর্চা বিষয়ের মধ্যে পড়ে। চিন্তা ধারার ইতিহাস এবং নৃতত্ত্ব বা সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব থাকে সঙ্গে। ভাষাবিজ্ঞানী এই দুটি ধারণার বিষয় নিয়ে চর্চা ত করে থাকেনই এবং তার সঙ্গে সাংস্কৃতিক প্রণালী ও রাখেন। যে টুকু দরকার তুলনা করার কাজে সেইটুকু জোগাড় করতে যতদূর তার বাইরে যেতে হয় ভাষা বিজ্ঞানী যান তবে অবিলম্বে ফিরে আসেন ভাষার সামাজিক পরিধিতে। কোন্ দিকে গেলে কেমন করে বিভিন্নতা বা একতা বাড়ানো যেতে পারে তার সঙ্কেত পাওয়া যায় মাঝে মাঝে কোন বড় বিজ্ঞানী বা দার্শনিকের কাছে। গঠন তত্ত্ব ও শব্দার্থতত্ত্ব ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় সহায়তা করে তবে ইন্দ্রিয়ভিত্তিক ভাষার কেন্দ্র বরাবরই প্রকৃতিস্থ স্থিরীকৃত বিধি বা আধার।

বাস্তব কোন ঘটনার পরিচয় দেওয়া হয় না যখন বলা হয় ভাষা একটা প্রণালী। চর্চার পথ শুধু দেখিয়ে দেওয়া হয়। ভাষা একটি মাত্র প্রণালী ত নয়। নানা গঠন ও শব্দার্থের প্রণালী দিয়ে শৃঙ্খলা বিহীন শব্দ পদরাশি নিয়মের মধ্যে এনে বোধগম্য করা হয়। গঠন ও শব্দার্থ বলতে আজকাল বুঝতে হয় চাল-চালনে যা স্বীকৃত হয়। গঠন প্রণালী সামাজিক ব্যবহারে সমর্থন পায় এবং শব্দার্থ ধরা পড়ে কথাবার্তায়। সমাজের আকার ও প্রসার তার যথার্থতা-বিহীন নিশ্চয়তায়, তার শৃঙ্খলাবিহীন গঠনে এবং তাহার ভুলভ্রান্তি বহুল সংজ্ঞায়। তৃতীয় ধারণা অনুসারে যদি ভাষাকে বলতে হয় তাহলে এমন গুণ এই প্রণালীর ওপরে আরোপ করতে হয় যার গঠন শব্দার্থ প্রণালীর বিপরীত। এমন প্রণালী হবে বিধি শব্দার্থ গঠিত, অসঙ্গত এবং প্রতিলিপিবিহীন। ব্যক্তির ওপরে জোর করে চাপাতে হবে।

দর্শনশাস্ত্রের তত্ত্ব ভাষাভিত্তিক হতে পারে। তবে তিনটি স্বতন্ত্র অর্থে হবে। এক অর্থের সঙ্গে অন্য অর্থের মিল নেই। (১) গঠনবিন্যাস সম্বন্ধে চর্চা করে দর্শন গণিত যুক্তিতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে (২) শব্দার্থের বিন্যাস সম্বন্ধে চর্চা করে দর্শন তত্ত্ববিদ্যায় বা ontology-তে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে (৩) সামাজিক চালচলন সম্বন্ধে চর্চা করে দর্শন ইন্দ্রিয়ভিত্তিক বিজ্ঞান-এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

কাজেই যখন দেখা যায় ভাষাভিত্তিক দর্শনে নানা মুনির নানা মত, আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

রবীন্দ্রযুগ ও যতীন্দ্রনাথ

বিনতা চট্টোপাধ্যায়

(উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলাসাহিত্যের মূলধারা আবর্তিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে অবলম্বন করে। রবীন্দ্রনাথের যা কবিধর্ম তাই মুখ্যতঃ এই যুগের সাধারণ সাহিত্যধর্মকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। রবীন্দ্রকে পরিবেষ্টিত করে ছিলেন যে সমস্ত গ্রহতারকা তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মাধুর্যটুকু নিলেন—কাব্যদেহে রবীন্দ্রভাষার পেলবতা জড়িয়ে দিলেন; কিন্তু অনুকরণীয় সেই কবিপ্রতিভার অভাবে কাব্যকে তাঁরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলেন না। ইংরেজী সাহিত্যের পরবর্তী রোমান্টিক কবিদের মতই তাঁরা বিপন্ন। রবীন্দ্রনাথের আপাত সরলতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁরা সহজ হতে চাইলেন। অথচ সে সহজের নীচে বেদনায়, দ্বন্দ্বে ও দহনে জীবন কি কঠিন! তাই এইসব কবিদের কাব্যে দেখা দিল 'সেই ফেনিলতা, সেই অসহায় অসংবৃত উচ্ছ্বাস যা 'স্বভাবকবি'র কুলক্ষণ;—শৈথিল্যকে স্বতঃস্ফূর্ত বলে; আর তন্দ্রালুতাকে তন্ময়তা ব'লে ভুল করলেন তাঁরা)—আর ইতিহাসে শ্রদ্ধেয় হ'লেন এই কারণে যে রবিতাপে আত্মাহুতি দিয়ে তাঁরা পরবর্তীদের সতর্ক করে গেছেন। (১)

(তবু বাংলাকাব্যের এই নিছক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে থেকে নির্গমনের পথ খুঁজছিল আর এক স্বতন্ত্র অভিপ্রায়। এবং সে অভিপ্রায় সার্থক হল নজরুলের আবেগে, মোহিতলালের বলিষ্ঠ ভোগবাদী জীবনদর্শনে, যতীন্দ্রনাথের খেদে-পরিতাপে, নৈরাশ্যে। সে নিষ্ক্রমণের পথ প্রথম দেখালেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭—১৯৫৪)। সেখানে তিনি অনেকের সঙ্গে 'ইত্যাদি' নন, একটি স্বয়ং স্বতন্ত্র অধ্যায়। 'তাঁর ভাষায় বক্তব্য, উপমা-অলঙ্কার চিত্রকল্পে এবং সর্বোপরি একটি নিজস্ব দার্শনিকতায় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রবীন্দ্র যুগের প্রথম বিদ্রোহী কবি।' (২))

সে যুগের বাংলাকাব্যের প্রধান উপজীব্য ছিল জাতীয়তাবোধ, রোমান্টিক স্বপ্নময়তা, সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস, পল্লীবাঙলার সারল্য ও অনাড়ম্বর শুচিতার আকর্ষণ, প্রেমের মাধুর্যে ও নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ আস্থা। এই শান্ত-মধুর পেলব-কোমল পটভূমিতে ১৩১৭ সালে যতীন্দ্রনাথ নিজস্ব দৃষ্টির বিশেষত্ব নিয়ে বাঙলা কাব্যজগতে আবির্ভূত হলেন 'শীত'-এর (৩) বন্দনা গেয়ে, যদিও তার গড়নে ছিল রবীন্দ্রনাথের 'বৈশাখ'-এর স্মৃতি,—

হি হি কম্প লাগিয়েছে বিশ্বে সন্ সন্
নিশ্বাসে তোমার শীত ভয়ঙ্কর
আকর্ষিছ মরনের পানে, শবাসন
কে গো যোগীশ্বর।

প্রথম 'শীত'-এই যতীন্দ্রনাথ মৃত্যুর হিমশীতলতার স্পর্শে হতচকিত। অথচ তখন যতীন্দ্রমোহন করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন, কালিদাস প্রমুখ অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত কবিরা রবীন্দ্রনাথেরই অনুধ্যানে ব্যস্ত।) সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দের মায়ারাজ্য, রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব, করুণানিধান প্রমুখ রবীন্দ্রানুসারী

কবিদের স্বপ্নময়তা, দ্বিজেন্দ্রলালের বিদ্রূপনিপুণতা, প্রমথ চৌধুরীর ফরাসী মননসুলভ লঘু-পরিহাসতরল বাগবৈদগ্ধ—এইসব বৈচিত্র্যের মাঝখানে যতীন্দ্রনাথ নিজের একটি বিশেষ সুর নিয়ে এলেন। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথে তাঁর কাব্যের সাধন শুরু হল।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় মানুষ হয়েও কুমুদরঞ্জন মূলতঃ মাটির মানুষ—তাঁর কাব্যের কোথাও অনাথ যুক্তির দ্বন্দ্ব-দুর্ভাবনা বা সংশয় নেই—সর্বত্র এক সহজ শান্তি বিরাজিত। শান্তিজল—ধানদূর্বা প্রভৃতির কবি করুণানিধানেও সেই সহজ সরল জীবনের আকাঙ্ক্ষা; অর্থহীন জীবনযন্ত্রণার সেখানে বিশেষ স্থান নেই। ব্রজবেণু-পর্ণপুট-এর রচয়িতা কালিদাস রায় বিংশ শতাব্দীরই এক প্রাচীন বৈষ্ণব পদকর্তা। পাশ্চাত্য শিক্ষা যথেষ্ট থাকলেও এঁরা কেউই অনপনেয় সংশয়ে আধুনিক নন—আধুনিক চিন্তার দুর্নিবার দ্বিধার প্রকাশ এঁদের সৃষ্টিতে তেমন করে কোথাও নেই। ফলে রবীন্দ্রপ্রতিভার অন্তরাধিকারে, আধুনিকতার অনাগ্রহে এঁরা আলোর সম্ভাবনা নিয়েও নিষ্প্রভ হয়ে রইলেন। আর এঁদের সমসাময়িক হয়েই বোধ হয় অসমর্পণে স্বাতন্ত্র্যে যতীন্দ্রনাথকে আমাদের এত চোখে পড়ল।

প্রথম মহাযুদ্ধ শুধু রাষ্ট্রীয় বিপ্লব নয়। মানুষের মূল্যমান, বিচারবোধ, মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি—সর্বত্রই বিপ্লব ঘটিয়েছিল এই প্রথম মহাযুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের শেষপর্বের কাব্যে ছোট গল্পে ('স্ত্রীর পত্র', 'হালদার গোষ্ঠী', 'ল্যাবরেটরি' প্রভৃতি) যে নবমূল্যায়নের পরিচয় আছে। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ঘটেছে কবির স্বভাবসুলভ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে, মানবিক দিক থেকে। একান্তভাবে কোন সামাজিক রাজনৈতিক চিন্তার পরিচয়ে নয়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও নয়। সেদিক থেকে প্রথম সে চেষ্টার প্রকাশ যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুলে। তাই রবীন্দ্র-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাঁদের জেহাদ ঘোষণা; তাই তাদের পথ পৃথক।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মোহিতলালের বিরোধ সৌন্দর্যানুভূতির দিক থেকে। (সৌন্দর্যবাদে রবীন্দ্রনাথ পুনশ্চ-র আগে পর্যন্ত মুগ্ধ সেই অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যচেতনায় মোহিতলালের বিশ্বাস ছিল না।) যা সুন্দর তাই সত্য এ ধারণা তিনি পোষণ করতেন না। কল্পলোকের সৌন্দর্যে ভুলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ বাস্তবকে অস্বীকার করতে তিনি পারেননি। পাশ্চাত্যসুলভ জীবনবাসনা, বলিষ্ঠ দেহবাদকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। 'পাপ', 'অঘোরপন্থী', 'কালাপাহাড়'—কবিতার নামকরণেই তাঁর মনোধর্ম প্রকাশিত। জীবনের সুরা আকণ্ঠ পান করে তিনি উন্মত্ত হতে চান, বলেন—'টিটকারি দাও মৃত্যুরে, ধর মড়ার মাথার খুলি'। মোহিতলাল বাঙলা কাব্যে মায়াবাদী, বৈরাগ্যপন্থী জীবনচেতনাকে অস্বীকার করে নূতন জীবনাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রত্যক্ষ বাস্তবকে স্বীকার করবার ব্যাপারে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য থাকলেও যতীন্দ্রনাথের কবিধর্মের যা বৈশিষ্ট্য সেই দুঃখবাদকে তিনি গ্রহণ করেননি। শোপেন-হাউয়ারীয় চিন্তা তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনি—যদিও কবি তাঁকে বন্দনা করেছেন ('পান্থ', বিস্মরণী)। দুঃখের কবিকে বরং তিনি বিদ্রূপই করেছেন। এখানেই দুজনের মূলগত পার্থক্য।

রুশবিপ্লবের আদর্শে প্রভাবিত হয়ে শোষক সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নজরুল আনতে চাইলেন সাম্যবাদ। আর তারই কারণে পীড়িত জনসাধারণের হয়ে দুনিয়ার মালিকের কাছে তাঁর অভিযোগ। (রবীন্দ্রনাথ মানুষের অভিজাত ভাবনার, সুস্পষ্টতার কবি। নজরুলকে দেখা গেল গেল সমাজের অবহেলিত জনগণের কাছের মানুষ, জীবনের অংশী, তিক্ত বাস্তব অভিজ্ঞতার চারণ কবি

রূপে। যতীন্দ্রনাথের মানসিকতা ও অত্যাচারিতের প্রতি সেই সমানানুভূতি, শোষক-সমাজের প্রতি অভিযোগ। তবু তারও ওপরে যতীন্দ্রনাথের কাব্যে পাই মর্মমূলে নিহিত এক দুঃখবাদ। নৈরাশ্যজনিত গভীর হতাশাব্যঞ্জক সুর ও শ্লেষতিক্ত কণ্ঠস্বর। দুঃখবাদ ও অবিশ্বাস তাঁর কাব্যের মূলমন্ত্র; তীক্ষ্ণ শাণিত বাক্যবাণে, তির্যক কটাক্ষের প্রবণতায় আর অসন্তোষের যুগোচিত বাগ্বিধি প্রণয়নে তাঁর প্রধান পরিচয়।

ব্যক্তিগত জীবনে যতীন্দ্রনাথ ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার। ইট-কাঠ-লোহালক্কর নিয়ে ছিল তাঁর কাজ-কারবার। জীবিকার দায়ে গ্রামবাঙলার পথে পথে তাঁকে ঘুরতে হয়েছে। সেই পথেই অসহায়, অশিক্ষিত রোগজীর্ণ গ্রামবাসীর দুর্দশাগ্রস্ত জীবন, পল্লীর ছন্নছাড়া হতশ্রী মূর্তি তাঁকে পীড়িত করেছে। সমসাময়িক রোমান্টিক কবিদের, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের অমলশোভায় ঝলসিত অঙ্গ পল্লীবাঙলাকে খুঁজে না পেয়ে কবি ক্ষুব্ধ। বলেছেন, 'তাকে (পল্লীশ্রী) পাওয়ার জন্য মন আমার আকুলিবিকুলি করছে। অনেক খুঁজেছি, পাইনি তবুও। প্রথমে নিজের ভাগ্যকেই দোষারোপ করেছি পরে ক্ষোভ হয়েছে—অপরাধী করেছি কবিদের।' (৪) আর সে বিক্ষোভকে প্রকাশ করার জন্যেই তিনি বেছে নিয়েছেন কাব্যের পথ। সমসাময়িক কবিদের কল্পনাকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন—

'কল্পনা, তুমি শ্রান্ত হয়েছ, ঘন বহে দেখি শ্বাস,
বারোমাস খেটে লক্ষ কবির একঘেয়ে ফরমাস!
(ঘুমের ঘোরে)

আর—'সেই চলার পথেই যা চোখে পড়ত, যা দেখতাম, যা মনে লাগত, সেই ধুলোবালি-লাগা জগৎই হয়ে উঠল আমার অঙ্গ।' (৫) এই স্বীকারোক্তি থেকেই তাঁর কবিতার স্বতোধর্ম অনুমান করা যায়। বাস্তবকে মেনে নিতে গিয়ে বাংলার তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় মানুষের দুঃখকে গভীরভাবে অনুভব করে কবি হয়ে উঠেছেন নৈরাশ্যবাদী। সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের নানা আশাভঙ্গ ও সম্ভবতঃ তাঁর কবি ধর্মকে প্রভাবিত করেছে। তাই তিনি বেছে নিয়েছিলেন জগতের অসাম্য অসঙ্গতিজনক দুর্দশা রুক্ষতার কথা, প্রকাশের বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গি। আর সবকিছুর ভেতরে কাজ করেছে এক ওতপ্রোত দুঃখবাদ।

রবীন্দ্রনাথ জীবনের সকলক্ষেত্রে আনন্দকে সন্ধান করেছেন, দুঃখের মধ্যেও তিনি আনন্দের সুর শুনেছেন তাঁর কাছে, এই দ্যুলোক মধুময়, মধুময় এই পৃথিবীর ধূলি। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ দুঃখের তাপে জীবনের সরস স্নিগ্ধতাকে হারিয়ে ফেলেছেন। সত্যেন্দ্রনাথে যে সংশয়ের ক্ষণিক আলোড়ন '(সাম্যের গান', 'আফ্রিম ফুল' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য) যতীন্দ্রনাথে তাই দেখা দিল চিত্তের স্থায়ীভাব রূপে। বলাকা, পত্রপুট, নবজাতক প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে দেখি, যুদ্ধকালীন বা যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর দুর্দশা রবীন্দ্রনাথকেও বিচলিত করেছিল। কিন্তু সে দুর্দশায় তিনি দেখেছিলেন বিশ্বমানবেরই সঙ্কট। ব্যক্তিমানুষের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার কষ্টকর অভিজ্ঞতা নয়। যতীন্দ্রনাথে কিন্তু সেই তুচ্ছ মানুষের ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের দুঃখই প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর দেবতা তাই চিরসুখময় শিব। রবীন্দ্রনাথের নটরাজের মত সেই শিবের পদক্ষেপে নূতন সৃষ্টির আভাস নেই।

সুখের দেবতা মরে যুগে যুগে, তুমি চির দুখময়,
সুখ বাঁচে মরে, দুঃখ অমর—তুমি মৃত্যুঞ্জয়। ('শিবস্তোত্র')

ঈশ্বর, প্রেম, প্রকৃতি—রোমান্টিক কবিধর্মের এই তিন অনুষঙ্গকে তিনি সবলে অস্বীকার করেছিলেন। এবং তাঁর আধুনিকতা এইখানেই। গভীর অধ্যাত্মচেতনা রবীন্দ্রনাথকে এক অতীন্দ্রিয় রহস্যলোকের সন্ধান দিয়েছিল, জাগতিক দুঃখকষ্টকে তিনি অস্বীকার করেছিলেন বৃহত্তের আশ্বাসে। দুঃখকে জেনেছিলেন অমৃতত্বের পাথেয় রূপে, ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে। অন্ধকারের মধ্যে তিনি তাঁর 'রাজার' পদধ্বনি শুনেছিলেন, ঝড়ের রাতে অনুভব করেছিলেন 'পরাণসখার' অভিসার। বলেছেন—'দুঃখের বেশে এসেছে বলে তোমারে নাহি ডরিব হে'। জীবনের এই অমৃতময় যন্ত্রণার মহৎ মূল্যকে তিনি তাঁর গল্পে কবিতায় প্রবন্ধে উপন্যাসে বারবার প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু যতীন্দ্রনাথ জীবনকে উদাসীন সন্ন্যাসীর দৃষ্টিতে দেখতে পারেন নি। মানুষের জীবনযন্ত্রণা, সামাজিক অত্যাচার তাঁকে ক্লিষ্ট করেছে। দৈব বা জড়জগতের পিছনে কোন একক চেতনসত্তায় তিনি অবিশ্বাসী। বলেছেন—

শুনহ মানুষ ভাই!
সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা আছে বা নাই! (দুঃখবাদী)

ঈশ্বরের প্রতিভূকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন—

তুমি শালগ্রামশিলা—
শোওয়া-বসা যার সকলি সমান তারে নিয়ে রাসলীলা! ('ঘুমের ঘোরে')

যদি নিয়ামক সত্তা কেউ থেকেও থাকেন, কবির বিশ্বাস, তিনি নির্মম, নিষ্ঠুর, খেয়ালী। অসহায় মানুষ তাঁর ক্রীড়নক মাত্র। ঈশ্বরকে তাই তাঁর মৎস্যশিকারী, গাড়োয়ান, কর্মকার বলে মনে হয়। প্রশ্ন করেন—

ও ভাই কর্মকার,—
আমারে পুড়িয়ে পিটানো ছাড়া কি নাইকো কর্ম আর? ('লোহার ব্যথা')

যেখানে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেন বলেন—

তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হত যে মিছে।

সেখানে যতীন্দ্রনাথ কোন প্রেমময় করুণাঘনের সাক্ষাত পান না। গ্রীক ট্রাজেডির মত, শোপেনহাউয়ারের মত তাঁরও বিশ্বাস সেই অন্ধ নিয়তিতে—মানুষকে যে দুঃখচক্রে ঘুরিয়ে মারে, পীড়ন করে আনন্দ পায় নতুবা জগতে এত দুর্বোধ্য ঘটনা, এত দুঃখ কেন? কেন বিধবা পাঁচীর একমাত্র ছেলে সাপের কামড়ে মারা যায়—কেন অন্নহীন চাষার ঘরে নবান্নের প্রহসন? কবির মতে 'ঘুমিওপ্যাথি' ছাড়া এ সমস্ত ঘটনার কোন সদুত্তর নেই—মুক্তিরও উপায় নেই। সাধারণ দুঃখকে রবীন্দ্রনাথ অতিমাত্রায় সূক্ষ্ম সুখ বলে মন্তব্য করেছেন ('দুঃখ', শান্তিনিকেতন)। জীবন সাহারায় যতীন্দ্রনাথের কাছে এ শুধু চেরাপুঞ্জির পরিহাস।

শোপেনহাউয়ার-ভারউইনের সৃষ্টির সেই নিহিত নির্মমতার রাস্তা ধরে যতীন্দ্রনাথের পল্লীপ্রকৃতি এক রুক্ষ ধূসর মরুমূর্তি নিয়েছে। মরুশিখা—মরুমায়া—মরীচিকা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে কবির

এ মনোভাব সুস্পষ্ট। ডারউইনের বিবর্তনবাদের সম্প্রসারণের ফলে সেকালের বাস্তববাদী আধুনিক কবিদের মন থেকে সুন্দরের স্বপ্ন মুছে গিয়েছিল। জীবজগতে অহরহ যে জীবনসংগ্রাম চলছে তা নিছক আত্মরক্ষার তাগিদে। প্রকৃতির সৌন্দর্য শুধু বংশরক্ষার প্রয়োজনে এই রূঢ় জ্ঞান কবিকে প্রকৃতির মায়াজাল ছিন্ন করার প্রেরণা দিয়েছে।—

বাহিরের এই প্রকৃতির কাছে মানুষ শিখিবে কিবা ?
মায়াবিনী নরে বিপথযাত্রী করিছে রাত্রি দিবা। ('দুঃখবাদী')

কবির এই বিপরীত কবিধর্ম সেই রোমান্টিক স্বপ্নালু কাব্যজগতের প্রথাসিদ্ধ পথকে অতিক্রম করে আশ্চর্য বলিষ্ঠতায় ও দুঃসাহসিকতায় নিজেকে প্রকাশ করেছে—

মিথ্যা প্রকৃতি, মিছে আনন্দ, মিথ্যা রঙিন সুখ ;
সত্য সত্য সহস্রগুণ সত্য জীবের দুঃখ ! ('দুখবাদী')

যে গোধূলি সন্ধ্যার রক্তরাগ রবীন্দ্রনাথের মনে আসন্ন মিলনের স্বপ্ন এনেছে, যতীন্দ্রনাথ সেই অস্তমিত সূর্যের রূপ দেখে বলেন—

বজ্র লুকায়ে রাঙা মেঘ হাসে পশ্চিমে আনমনা—
রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধ'রে রঙিন বারাঙ্গনা। ('দুঃখবাদী')

বলেছেন—

আকাশ নিতান্ত নীল মৃত্যুর মদিরায়
জীবনের নেশা কাঁপে তারায় তারায়।

এই যে সীমার জগৎ যার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ অরূপের মধু পান করেন, অসীমের স্পর্শ পান, দুঃখবাদী জীবনচেতনায় তার বিন্দুমাত্র মহিমা নেই। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতিতে পেয়েছিলেন শান্তি, আনন্দ, শিক্ষা, আর যতীন্দ্রনাথ দেখেছেন 'খাদ্যে খাদকে বাঘে বাদকে প্রকৃতির ঐশ্বর্য'। ('দুঃখবাদী')

প্রকৃতির প্রতি যতীন্দ্রনাথের যে বিরূপতা এবং অবিশ্বাস তার ওপর কবির সমসাময়িকতার প্রতিক্রিয়া প্রতিবাদও অনেকখানি। সৌন্দর্যবাদী ও আশাবাদী রবীন্দ্রনাথ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি বলে চেতনায়-অবচেতনে যতীন্দ্রনাথের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাগুলির প্রতিক্রিয়া রূপে, 'সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা'র প্রতিবাদ রূপে।

ঠিক উপরি উক্ত কারণেই কবির চোখে প্রেমও বর্ণহীন। তা বংশরক্ষা তথা আত্মরক্ষারই অঙ্গস্বরূপ। শোপেনহাউয়ারের যে মন্তব্য, 'Love is a deception practiced by nature.'—একথা তিনি মানতেন। রবীন্দ্রানুসারী কবিদের প্রেমবিলাসকে ঠাট্টা করে তিনি বলেছেন—

মরণে কে হবে সাথী,
প্রেম ও ধর্ম পারে না জাগিতে বারোটার বেশি রাতি ! ('ঘুমের ঘোরে')

জাগতিক দুঃখে কষ্টে, সহস্র অত্যাচার অনাচারে জর্জরিত জীবনের যন্ত্রণার মধ্যে প্রেমের কোমল রূপের কল্পনায় তিনি অসহিষ্ণু। সহজাত ভঙ্গিতে সে প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন—

অভাবের লাথো ফুটো বাক্যের ফাঁসে বুনে
মামুলি প্রেমের নেট্-মশারিটা টাঙিয়ে নে। ('মন-কবি')

জীবন সম্বন্ধে যতীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল জীবন মরণের বৃন্তে-ফোটা ফুল। 'মরণের দমে জীবনের ঘড়ি টিকটাক ঠিকঠাক'। তবু 'এই দুঃখদর্শন কবিকে জীবনরসের প্রতি বিতৃষ্ণ করে নাই। দুঃখের ফ্রেমে আঁটা হইলেও জীবনচিত্রের উজ্জ্বলতা তাঁহার কিছু কম নয়।' ()৬) প্রকৃতপক্ষে দুঃখবাদ যতীন্দ্রনাথের বুদ্ধিবাদী জীবনদর্শনেরই ফল। আর এই স্বতন্ত্র জীবনদর্শনই তাঁর কাব্যপ্রকৃতিকে অন্যপথে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে।

ভাষার ব্যবহারেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষা সাধারণত তৎসম শব্দসমৃদ্ধ। মধুর। সেখানে বৈষ্ণব পদাবলী, রামায়ণ, মহাভারত, ছেলেভুলানো ছড়া—সমসাময়িক প্রচলিত ভাষার সঙ্গে সঙ্গে আনাচকানাচের ভাষারও গভীর যোগ দেখি। তাঁর কাব্য ভাষায় তবুও কতকগুলি শব্দ অন্ত্যজ বলে পরিত্যক্ত ছিল। যতীন্দ্রনাথের কাব্যে সেই তথাকথিত অন্ত্যজ শব্দেরই ভিড়। ভাষাকে সঙ্কেতবহ' শরস্থলভ গভীর বেধক তীক্ষ্ণতা' এবং ধ্বনি বৈচিত্র্যের ঐশ্বর্য দান করার জন্যে তিনি তৎসম শব্দের পাশাপাশি প্রচুর দেশজ শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর উপমাগুলি সংগৃহীত হয়েছে ইটকাঠের বাস্তব জগৎ থেকে। ভাষাও তাই তাঁর অনুরূপ। সাঁড়াসি, হাতুড়ি, ফাটালাট্টু, গাড়োয়ান প্রভৃতি শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার তিনি করেছেন। এদিক থেকেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট। ভাব ভাষা কাব্যদেহ গঠন—সবদিক থেকেই তিনি প্রথাকে ত্যাগ করে নিজস্ব পথ তৈরি করে নিয়েছিলেন। 'যতীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে দাবদাহের ভ্রূকুটির পাশে বিদ্রূপের তির্যক হাসি, বলিষ্ঠ স্পষ্টোক্তির সহিত শাণিত বক্রোক্তির অপ্রত্যাশিত সঙ্গতি, দৈবের প্রতি বজ্রমুষ্টি নিক্ষেপের পাশে জীবনের ছেঁড়া কাঁথাখানি জড়াইয়া লইবার অভ্যাসসিদ্ধ বাহুপ্রসারণ এই সকল যতীন্দ্রনাথের ভাব ও নির্মিতি উভয় ক্ষেত্রেই একটা দ্বান্দ্বিক বিচিত্র স্বাদ সৃষ্টি করিয়াছে।' (৭)

রবীন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্রনাথের ধারণাগত মিল যে কোথাও ঘটেনি তা নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ কবিতায় বলেছেন, 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি বিচিত্র ছলনাজালে।' এ যেন দুঃখবাদী যতীন্দ্রনাথেরই যন্ত্রণাবিদ্ধ মনের প্রকাশ। মানসীর 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' 'প্রকৃতির প্রতি' প্রভৃতি দু একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথও প্রকৃতিকে নিষ্ঠুর নির্মম বলে উল্লেখ করেছেন' 'নিয়মের লৌহকক্ষ' বলেছেন।

আবার ওদিকে যতীন্দ্রনাথও তাঁর কবিজীবনের সায়াহ্নে রবীন্দ্রবিশ্বাসের দিকে ফিরে এসেছেন। কাব্যনামের পরিবর্তন লক্ষ্য করলেই মনোভঙ্গির এই পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রথম জীবনে তাঁর চারিদিকে তিনি তৈরি করে নিয়েছিলেন মরুর রুক্ষ পরিবেশ। দ্বিতীয়ার্ধে তিনিই আবার সায়ম্ ত্রিযামা নিশান্তিকার মধুর শান্তিতে আশ্রিত। কবি তখন প্রেমের ও প্রকৃতির সৌন্দর্য, আনন্দরূপ, অমৃতকে আস্বাদ করেছেন। . 'life is evil' শোপেনহাউয়ারীয় এ জীবনদর্শন তখন তিনি আর মানেন বলে মনে হয় না। এ পর্যায়ে কবি যৌবনের ছন্নছাড়া মানসভঙ্গির জন্যে আক্ষেপও করেছেন—

বসন্তে উপেখিনু ফুলে ফুলে মিনতি
বর্ষায় মেঘে মেঘে আহ্বান
হেমন্ত সন্ধ্যায় মাঠে মাঠে মন ধায়
কোন সুন্দরে করি সন্ধান। ('হেমন্ত সন্ধ্যায়')

সুন্দরবিরোধী মনে সুন্দরের আসঙ্গলিপ্সা জেগে উঠেছে—

ওগো সুন্দর, আমার জীবনে
আনন্দরূপে ফুটিবে না কি ? ('সুন্দর')

প্রৌঢ়াবস্থায় হতাশ ক্লান্ত কবি নিজেকে নূতন করে চিনে বলেছেন—

'বহু বিলম্বে এবার বুঝেছি
তোমারে ফেলিয়া তোমারে খুঁজেছি'।

রোমান্টিকতাবিরোধী মনে নব্য রোমান্টিক মনোভাবের আমেজ এবং প্রেমকে অবলম্বন করে গভীর জীবনশক্তির প্রকাশ ঘটেছে যতীন্দ্রনাথের শেষপর্বের কাব্যগুলিতে।

যতীন্দ্রনাথের সংশয় অবিশ্বাস মাঝে মাঝে রবীন্দ্রবিশ্বাসে লীন হয়ে গেছে। কিন্তু বাঙলাকাব্যে তাঁর যে অনন্যতার দাবি তা এই রবীন্দ্রমুখী জীবনদৃষ্টির জন্যে নয়। সে দাবি তাঁর প্রথমজীবনের তীব্র দুঃখানুভূতি, বাস্তবপ্রীতি ও তীক্ষ্ণ শ্লেষব্যঞ্জক প্রকাশভঙ্গির মধ্যে। রবীন্দ্রধারণায় প্রত্যাবর্তনের পরও কবি যে বিশ্বাসকে পুরোপুরি ছাড়তে পারেননি। মঞ্চেমধ্যেই তার প্রকাশ ঘটেছে—

কে আমার বুকে চিরতৃষ্ণাজর্জর
চাহে শুধু দূর সুন্দর মরীচিকা ?
বৃথা ডাকে তারে বাণী কূপ সরোবর,
অন্তরে জ্বলে অনির্বাণ্য শিখা। ('কবি নহি')

'কল্লোল' গোষ্ঠীর কবিরা যে তাঁকে তাঁদের পথিকৃৎ বলে মানেন তা এই অনির্বাণ্য শিখার দহনশীলতার জন্যেই। পূর্বসূরীর যে ঋণ স্বীকার করে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন—'যতীন্দ্রনাথের কাছে কি পেয়েছিলাম আমরা ? পেয়েছিলাম এই আশ্বাস যে আবেগের রুদ্ধশ্বাস জগৎ থেকে সাংসারিক সমঝলে নেমে এসেও কবিতা বেঁচে থাকতে পারে।.....প্রবন্ধধর্মী যুক্তিতর্কের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ এক একটি আলোচনা, রেশতোলা পঙ্‌ক্তি.....আর একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি।'৮

১. সাহিত্যচর্চা, 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক,' বুদ্ধদেব বসু।
২. সাহিত্য ও সাহিত্যিক, 'কচিভাবের কবি', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।
৩. প্রবাসী, মাঘ, ১৩১৭।
৪, ৫. 'একটি স্মরণীয় দুপুর', অজিত দাশ, হোমশিখা, ৩য় বর্ষ ফাল্গুন।
৬. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড), সুকুমার সেন।
৭. কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাঙলা কবিতার প্রথম পর্যায়, শশিভূষণ দাশগুপ্ত।
৮. কালের পুতুল, 'যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত', বুদ্ধদেব বসু।

কর্তাভজা

গোবিন্দগোপাল সেনগুপ্ত

বাংলায় বহুবিধ ধর্ম-সম্প্রদায় আছেন। বীরভূমে যেমন বাউল তেমনি কর্তাভজা সম্প্রদায়ও বাংলার অনেক স্থানে একটি প্রধান সম্প্রদায়। উনবিংশ শতাব্দীতে এই সম্প্রদায়ের প্রবল প্রতিপত্তি ছিল এবং বহু ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিও এই সম্প্রদায়ের অনুরাগী ভক্ত ছিলেন।

১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মহাদেব বারুই তাঁর বরোজে পান চাষের তদারকি করার সময় একদিন একটি বালককে দেখতে পান। এই বালকটি কার সন্তান, কোথা থেকে এসেছে এসব কিছুই জানা যায়নি। মহাদেব বালকটিকে নিজগৃহে নিয়ে লালন-পালন করেন। বালকটি বার বছর তাঁর গৃহে থাকে তারপর গৃহত্যাগ করে চলে যায়। সাতাশ বছর বয়সে সে বেজবা নামক গ্রামে ফিরে আসে। তখন তিনি সম্পূর্ণ সাধু। তাঁর পরনে কৌপীন, গায়ে ছেঁড়া কাঁথা। সঙ্গী একজন শিষ্য। ইনিই আউলচাঁদ নামে প্রসিদ্ধ হন। আউলচাঁদ ঈশ্বরে সমর্পিত প্রাণ। কোন জাতি বিচার নাই। প্রচুর ভক্ত তাঁর কাছে এসে জড়ো হল। ভক্তেরা তাঁকে বলতেন আউলচাঁদ শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার। স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে সকলে তাঁর ভক্ত হতে লাগল। আউলচাঁদ অনেক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর কৃপায় দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় হত। শিষ্যদের বিশ্বাস ছিল যে আউলচাঁদ গঙ্গায় হেঁটে বেড়াতেন। তিনি শিষ্যদের কয়েকটি উপদেশ বিশেষভাবে পালন করতে বলতেন। ব্যাভিচার করবে না, চুরি করবে না, হত্যা করবে না, মিথ্যা বলবে না, কঠোর বাক্য বলবে না, অযথা বাক্য বলবে না। আউলচাঁদই কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আউলচাঁদ দেহরক্ষা করেন। কর্তাভজারা বাউলদের মত সঙ্গীতে অনুরাগী। সঙ্গীত তাঁদের সাধনার অন্যতম উপায়।

কর্তাভজারা বিশ্বাস করেন যে গুরু দেহত্যাগের পর তাঁর আত্মা অন্য দেহ আশ্রয় করেন। আউলচাঁদের দেহরক্ষার পর তাঁর আত্মা রামশরণ পালের দেহ আশ্রয় করেন বলে কর্তাভজাগণের বিশ্বাস। রামশরণ পাল থাকতেন ঘোষপাড়ায়। আউলচাঁদের পর রামশরণ কর্তা হন। পাল মহাশয়ের গৃহে কর্তার আসন বা বেদী রক্ষিত হয়। একে বলা হয় ঠাকুর বা কর্তার প্রতিনিধি। রামশরণের দেহরক্ষার পর রামদুলাল কর্তা হন। বহু অনুরাগী এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন। রামদুলালের দেহত্যাগের পর তাঁর স্ত্রী কর্তার গদী পান, তারপর রামদুলালের পুত্র ঈশ্বর পাল কর্তা হন। কর্তার নীচে একদল প্রধান ভক্ত আছেন তাঁদের বলা হয় মহাশয়। বিভিন্ন স্থানে যে সব কর্তাভজা আছেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা এঁদের কাজ। প্রত্যেক কর্তাভজাকে কিছু করে অর্থ কর্তার প্রণামী হিসাবে দিতে হয়। এই প্রণামীকে বলা হয় খাজনা। কর্তাভজারা কর্তাকে ভগবানের মত ভক্তি করেন—তাঁরা বলেন, কর্তাই সত্য, আর সব মিথ্যা। কর্তা তুমি আমাকে যা খাওয়াও তাই খাই। তুমি যেখানে যেতে বল সেখানেই আমি যাই। কর্তাই সত্য আর সব মিথ্যা।

দোল ও রাসযাত্রার সময় ঘোষপাড়াতে বিরাট উৎসব হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে সহস্র সহস্র নরনারী ঘোষপাড়ার মেলায় সমবেত হন। সতীমা কর্তা রামদুলালের মাতা। ঘোষপাড়ার হিমসাগর পুষ্করিণী এবং নিকটেই সতীমাতার সমাধি আছে। ভক্তগণ হিমসাগরে স্নান করে সতীমায়ের সমাধির মাটি গায়ে মাখেন। এতে কঠিন রোগ ভাল হয়ে যায় বলে ভক্তগণের বিশ্বাস।

কবি নবীনচন্দ্র সেন নদীয়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের থাকাকালীন উৎসবের সময় ঘোষপাড়ায় যান। তিনি এই সম্প্রদায়ের ভক্তি, বিশ্বাস দর্শন করে এবং সঙ্গীতাদি শুনে মুগ্ধ হন। তাঁর বিখ্যাত আত্মজীবনী 'আমার জীবন' গ্রন্থে তিনি এই সম্পর্কে সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

(মযূরাক্ষী পত্রিকা থেকে।)

স মা লো চ না

স্মৃতিকথা ॥ মীরা দেবী ; বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা ; পৃঃ ৬০, মূল্য-নয়টাকা।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ কন্যা মীরা দেবীর নাম বাঙালী পাঠকের কাছে সুপরিচিত। রবীন্দ্রনাথের দুই পুত্র ও তিন কন্যার মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ ও যথাক্রমে জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা মাধুরীলতা ও রেণুকা অকালে পরলোকগমন করেন। পিতা রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুকাল পর্যন্ত বেঁচেছিলেন শুধু জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবী। নিজের বিদ্যা বুদ্ধি প্রতিভা-কর্মশক্তি সব কিছুই এই দুই ভ্রাতা ভগ্নী উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের পরমপূজ্য ও বিশ্ববন্দিত পিতৃদেবের সর্ববিধ সেবায়। কবিগুরুর শতবার্ষিকী বৎসরে রথীন্দ্রনাথ পরলোক গমন করেন। মীরাদেবীর মৃত্যু হয় ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এখন থেকে প্রায় ছয়বৎসর পূর্বে।

এই বইটিতে মীরা দেবীর শৈশব বা বাল্যকালের স্মৃতিকথাই শুধু বর্ণিত হয়েছে। এই রচনার মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন—'আমার রোগ্যশয্যার দীর্ঘ-অবসর কাটাবার জন্য আমার এই স্মৃতিকথার অবতারণা। আমার এই রচনা অন্যের ভালো লাগবে বলে আশা করি না। এর মধ্যে কোন কাহিনী বা গল্প নেই। শুধু কয়েক জনের ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছি যাঁরা আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছেন। আমার এই রচনার মধ্যে ঘটনার বা সময়ের কোন পূর্বাপরতা খোঁজবার চেষ্টা পাঠকেরা যেন না করেন। যখন যেটা মনে পড়েছে আপন মনে তাই লিখে গিয়েছি।'

লেখিকা ভূমিকায় যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন—এলেখা অন্যের ভাল লাগবে না, এটা অমূলক। ঘটনার বা সময়ের পূর্বাপরতা বজায় থাকুক বা নাই থাকুক—বইটি আমাদের মনে হয় সকলেরই ভাল লাগবে। আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে শৈশব বাল্যকালের যে ছবি তিনি আঁকতে চেয়েছেন তা সার্থক হয়েছে। এমন সরল সাবলীল ভাষায় এই স্মৃতি কথাটি লিখিত হয়েছে যে একবার পড়তে বসলে এক নিঃশ্বাসেই সবটুকু পড়ে নিতে পাঠকের ইচ্ছা জাগে। একজন বর্ষিয়সীর পরিবর্তে একটি আপনভোলা কিশোরীর মুখ থেকে রূপকথার কাহিনী শোনার আনন্দে পাঠকের হৃদয় আপ্লুত হয়ে ওঠে।

এই বইয়ে যাঁদের কথা উল্লিখিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন জমজমাট ঠাকুরবাড়ীর কর্তা দেবেন্দ্রনাথ, তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবী, জ্যাঠাতুতো দাদা নীতীন্দ্রনাথ, মামাতো দাদা সত্যপ্রসাদ, জেঠামশাই দ্বিজেন্দ্রনাথ, মেজজ্যাঠাইমা জানদানন্দিনী দেবী, পিতা রবীন্দ্রনাথ, বড়দাদা রথীন্দ্রনাথ, ছোট ভাই শমীন্দ্রনাথ, দুই বড়দিদি মাধুরীলতা ও বেণুকা, দুই জামাইবাবু শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী ও সত্য ভট্টাচার্য, বৌঠান প্রতিমা দেবী প্রভৃতি। শান্তিনিকেতনের অজিত চক্রবর্তী, ক্ষিতিমোহন সেন নন্দলাল বসু এবং এঁদের পরিবার বর্গের কথাও এই বইয়ে আকর্ষণীয়ভাবে আলোচিত হয়েছে। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি, শিলাইদহ, মজফরপুর শহর এই সব স্মৃতিচারণার পটভূমি। মাতৃহীন পুত্র-কন্যাদের সেবা গ্রেহ ও শিক্ষাদান রত পিতা রবীন্দ্রনাথের যে ছবি বইটির মধ্যে ছড়িয়ে আছে—তা

পাঠককে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করে। এই বই-এ লেখিকার বাল্য ও কৈশোর জীবনের স্মৃতি চিত্র স্থান পেয়েছে, তাঁর বিবাহোত্তর জীবনের কথা এতে পাওয়া যায় না। সেই হিসাবে এই বইটির নামকরণ হওয়া উচিত ছিল—'ছেলেবেলার স্মৃতিকথা' ধরণের কিছু।

এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট ২৩ টি আলোক চিত্র বইখানির অন্যতম আকর্ষণ। সুষ্ঠু সম্পাদন ও প্রকাশনায় বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ বাংলা পুস্তক প্রকাশনের ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট ঐতিহ্যের অধিকারী। আলোচ্য গ্রন্থটিতে এই উচ্চমান অক্ষুণ্ণ রয়েছে। আশাকরি সুমুদ্রিত ও সুশোভন কবিকন্যার রচনাটি পাঠক সমাজে যথোচিত সমাদর লাভ করবে।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত